বাংলাদেশের ইতিহাস: ভাষা, সংস্কৃতি ও পরিচয়

প্রথম অধ্যায়

প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগ

Pre-colonial Era

> প্রাক-ঔপনিবেশিক বাংলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ছিল বহুমাত্রিক, যেখানে কৃষি ও সুফিবাদের প্রভাবে গড়ে উঠেছিল এক অনন্য মানবিক মেলবন্ধন।

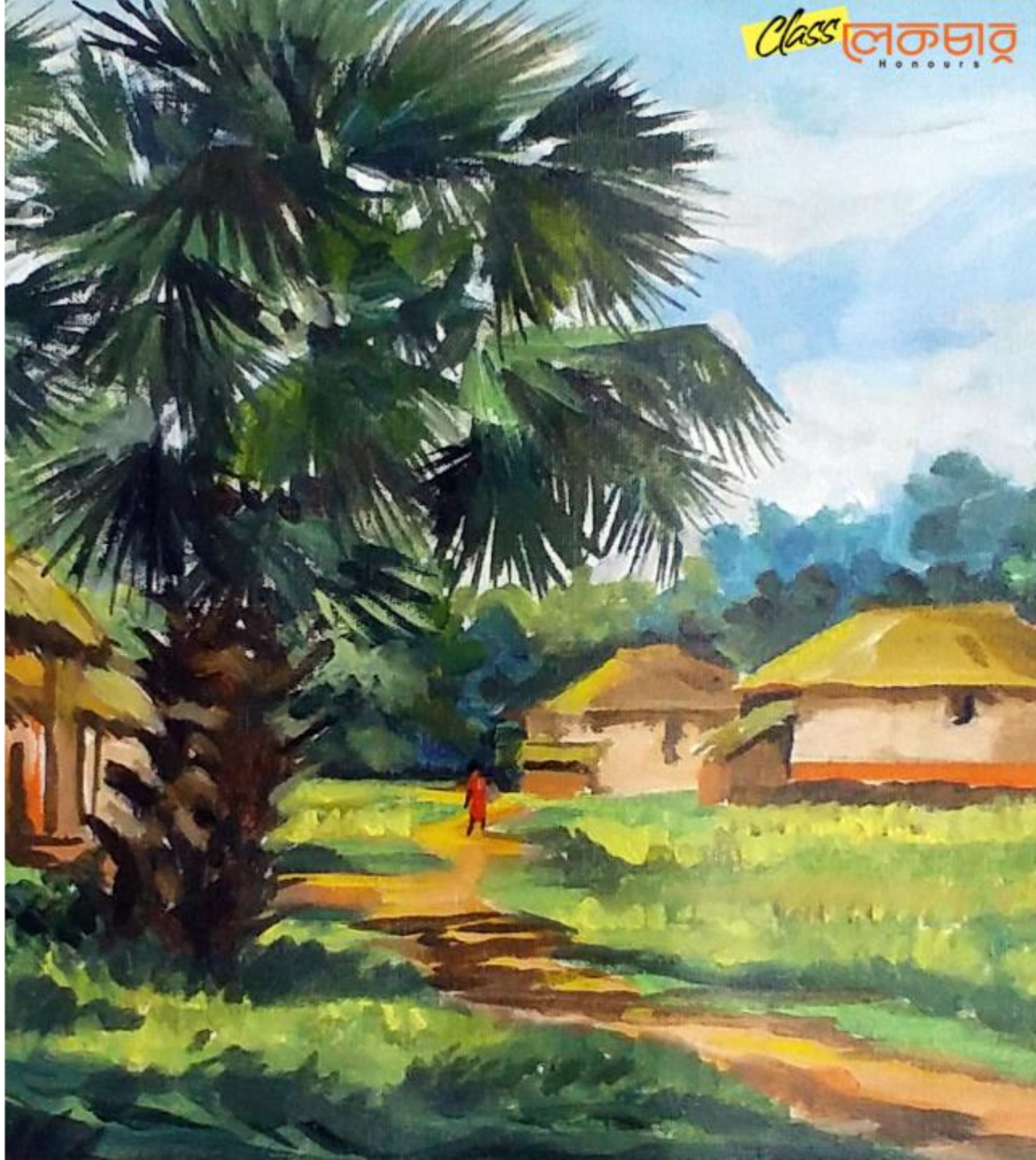

প্রাচীন বাংলার জীবন, সংস্কৃতি ও প্রধান জনপদ

জীবন ও সংস্কৃতি: প্রাচীন বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি ছিল সমৃদ্ধ। শশাঙ্ক ছিলেন প্রথম স্বাধীন শাসক। পাল আমলে বৌদ্ধধর্ম ও শিল্পকলার বিকাশ ঘটে, আর সেন আমলে হিন্দুধর্ম ও ভাস্কর্যের প্রসার হয়। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম শাসনের সূচনার মাধ্যমে মধ্যযুগের সূচনা হয়।

বঙ্গ: অন্যতম প্রাচীন জনপদ। ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে প্রথম বঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিক্রমপুর ও নব্যমণ্ডল বঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ছিল।

পুণ্ড্র: এর রাজধানী ছিল পুণ্ড্রনগর (মহাস্থানগড়)। বর্তমান বগুড়া, রাজশাহী ও দিনাজপুর অঞ্চল এর অন্তর্গত।

বরেন্দ্র: গঙ্গা ও করতোয়া নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল। পাল যুগে এটি প্রশাসনিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

গৌড়: শশাঙ্কের রাজধানী ছিল **গৌড়** । বর্তমান মালদহ ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে এর অবস্থান ছিল।

অন্যান্য জনপদ ও বাণিজ্যকেন্দ্র

সমতট: কুমিল্লার আশপাশের অঞ্চল, সমুদ্রবাণিজ্যের জন্য পরিচিত।

হরিকেল: চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলের বিস্তৃত এলাকা, বন্দর ও বাণিজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

চন্দ্রদ্বীপ: বরিশাল, খুলনা ও বাগেরহাট অঞ্চলে অবস্থিত। চন্দ্রবংশীয় শাসকদের অধীনে পরিচিতি পায়।

রাঢ়: গঙ্গা ও ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী। এটি উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ে বিভক্ত ছিল।

সুহ্ম: দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জনপদ। সমুদ্র উপকূলের নিকটবর্তী হওয়ায় বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

তাম্রলিপ্ত: প্রাচীন বাংলার অন্যতম প্রধান সমুদ্রবন্দর (বর্তমান তমলুক)। ভারত, শ্রীলঙ্কা ও চীনের সঙ্গে সমুদ্রপথে বাণিজ্য চলত।

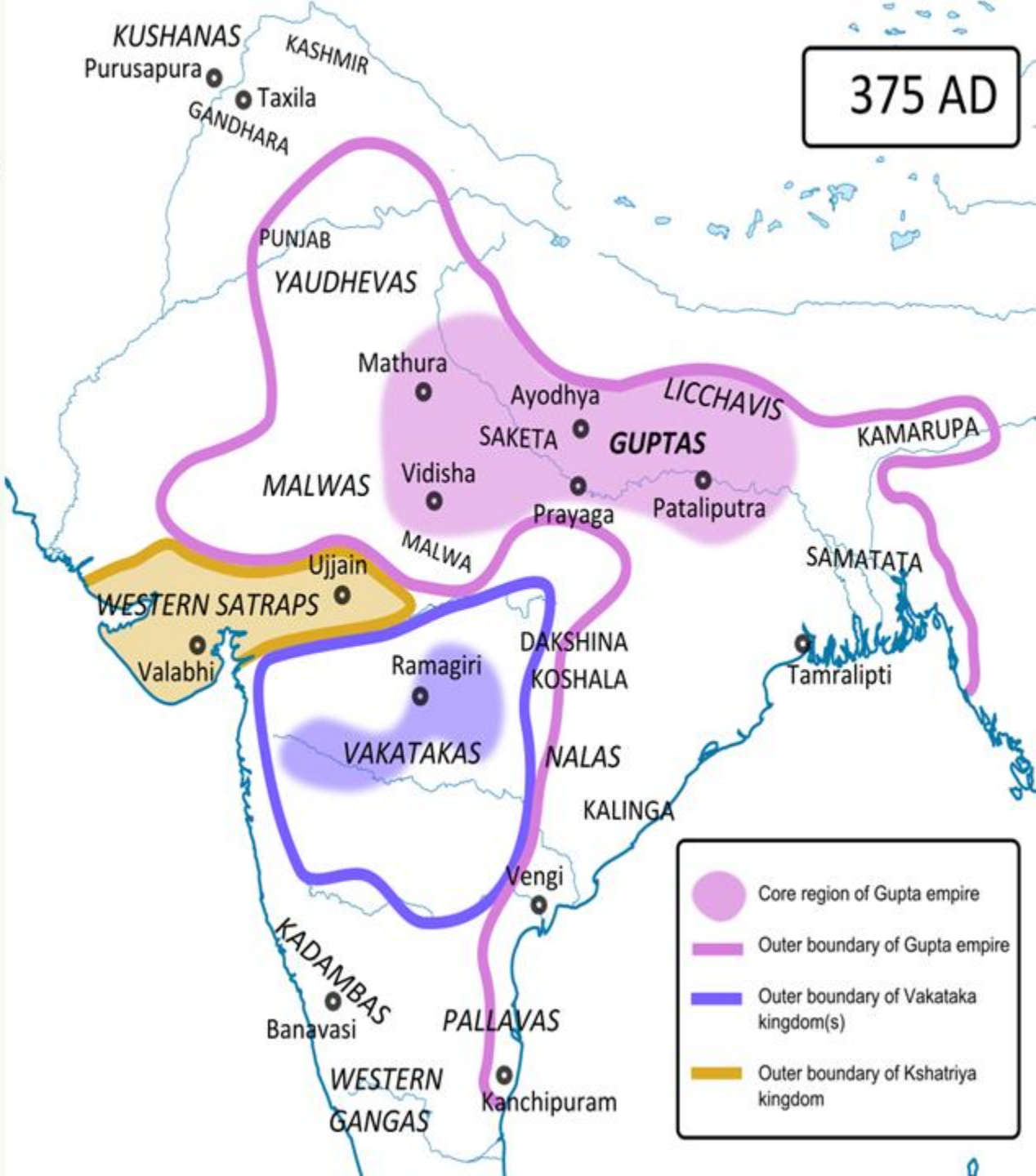

প্রাচীন বাংলা: মৌর্য থেকে গুপ্ত শাসন

মৌর্য শাসন: চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও সম্রাট অশোকের শাসনামলে উত্তরবঙ্গ ও পুণ্ড্রনগরে মৌর্য প্রশাসন বিস্তৃত ছিল, যার প্রমাণ পাওয়া যায় মহাস্থানগড়ের শিলালিপিতে।

মৌর্য-উত্তর যুগ: রাজনৈতিক অস্থিরতার মাঝেও কুষাণ প্রভাব ও বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে বাংলার বাণিজ্যিক গুরুত্ব বজায় ছিল।

গুপ্ত শাসন: শ্রীগুপ্ত ও সমুদ্রগুপ্তের অধীনে বাংলার বিস্তৃতি ঘটে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (তাম্রলিপ্ত ও সমতট বন্দর) এবং শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ব্যাপক বিকাশে এই যুগটি বাংলার ইতিহাসের স্বর্ণালী ভিত্তি স্থাপন করে।

গুপ্ত যুগে বাংলার শাসনব্যবস্থা

ভুক্তি ও বিষয় প্রশাসন

বাংলাকে কয়েকটি 'ভুক্তি' (প্রদেশ) ও 'বিষয়'-এ (জেলা) ভাগ করা হয়। ভুক্তি ও বিষয়ের শাসনভার যথাক্রমে উপরিক মহারাজ ও বিষয়পতির অধীনে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হতো।

স্বায়ত্তশাসিত গ্রাম ও নগর প্রশাসন

প্রশাসনের সর্বনিম্ন একক গ্রাম ছিল সম্পূর্ণ স্বশাসিত, যা পরিচালিত হতো 'গ্রামিক' ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের পরামর্শে। বড় শহরগুলোতে নিয়োজিত ছিল ব্যবসায়ী ও পেশাজীবীদের নিয়ে গঠিত 'নিগমসভা'।

বিশেষায়িত কর্মকর্তা ও সুশাসন

রাজস্ব ও বাণিজ্য সচল রাখতে নগরশ্রেষ্ঠী, কায়স্থ ও কুলিকগণ সক্রিয় ভূমিকা রাখতেন। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকলেও স্থানীয় প্রশাসন স্বাধীনভাবে কাজ করায় সাধারণ জনগণের জীবন ছিল সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ।

শশাঙ্ক ও মাৎস্যন্যায়ের যুগ (৬০৬–৭৫০ খ্রি.)

রাজা শশাঙ্ক: প্রথম স্বাধীন সার্বভৌম নরপতি

- ৬০৬ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে বাংলার রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটিয়ে স্বাধীন গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। কর্ণসুবর্ণে রাজধানী স্থাপন করে বাংলা, বিহার ও ওড়িশা জুড়ে বিশাল এক সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন।
- উত্তর ভারতের শক্তিশালী রাজা হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মণের যৌথ প্রতিরোধ ভেঙে বাংলাকে উত্তর ভারতের রাজনীতিতে একটি প্রভাবশালী অবস্থানে উন্নীত করেন.

মাৎস্যন্যায়ের যুগ: প্রাচীন বাংলার অরাজকতা

- ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলায় প্রায় এক শতক ধরে তীব্র রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। কোনো কেন্দ্রীয় শাসন না থাকায় দেশ জুড়ে চরম অরাজকতা বিরাজ করে।
- **মাৎস্যন্যায় রূপক:** পুকুরের বড় মাছ যেমন ছোট মাছকে গ্রাস করে, সমাজেও ঠিক তেমনি শক্তিশালী ব্যক্তিরা দুর্বল সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার ও শোষণ চালাত।

চিত্র: সার্বভৌম বাংলার প্রতীক রাজা শশাঙ্কের আমলের প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা

বাংলায় পাল রাজবংশের শাসন

মাৎস্যন্যায়ের অবসান ও গোপালের নির্বাচন

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর দীর্ঘ এক শতাব্দীর অরাজকতার অবসান ঘটিয়ে বাংলার নেতৃবৃন্দ সর্বসম্মতভাবে জনপ্রিয় সামন্ত গোপালকে রাজা নির্বাচিত করেন। এভাবে বাংলায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশের ভিত্তি স্থাপন

বাংলার ইতিহাসে প্রথম দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গোপাল। তিনি সমগ্র বঙ্গদেশকে এক শাসনে এনে সামাজিক সংহতি এবং চারশ বছরের পাল শাসনের মজবুত ভিত্তি গড়েন।

চিত্র: পাল স্থাপত্যের অমর নিদর্শন সোমপুর মহাবিহার (পাহাড়পুর)

সাম্রাজ্যের গৌরব ও স্বর্ণযুগ (৭৮১–৮৬১ খ্রি.)

ধর্মপাল ও উত্তর ভারতের ত্রিপক্ষীয় সংগ্রাম

গোপালের পুত্র ধর্মপাল (৭৮১-৮২১ খ্রি.) উত্তর ভারতের কান্যকুব্জকে কেন্দ্র করে প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটদের সাথে ঐতিহাসিক 'ত্রিপক্ষীয় সংগ্রামে' জড়িয়ে পড়েন এবং আধিপত্য বিস্তার করেন।

দেবপালের অধীনে সর্বোচ্চ বিস্তার ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি

দেবপালের (৮২১-৮৬১ খ্রি.) আমলে পাল সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তৃত হয়। তাঁর করদ রাজ্য ছিল আসাম ও উড়িষ্যা। তাঁর সময়ে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এশিয়ার বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

সংকট, বরেন্দ্র বিদ্রোহ ও রামপাল

কৈবর্ত বিদ্রোহ ও পাল সাম্রাজ্যের বিপর্যয়

দ্বিতীয় মহীপালের অন্যায় শাসনের বিরুদ্ধে বরেন্দ্রভূমির কৈবর্তরা সফল বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কৈবর্ত নেতা দিব্য ও তাঁর উত্তরসূরি ভীম বরেন্দ্রে স্বাধীন শাসন কায়েম করেন।

রামপাল কর্তৃক গৌরব পুনরুদ্ধার

পাল রাজবংশের শেষ শক্তিশালী শাসক রামপাল প্রলোভন ও কূটনীতিক কৌশলে সামন্তদের সহায়তায় এক বিশাল বাহিনী গঠন করেন। তিনি ভীমকে যুদ্ধে পরাজিত ও হত্যা করে বরেন্দ্রভূমি উদ্ধার করেন এবং 'রামাবতী' নামে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন।

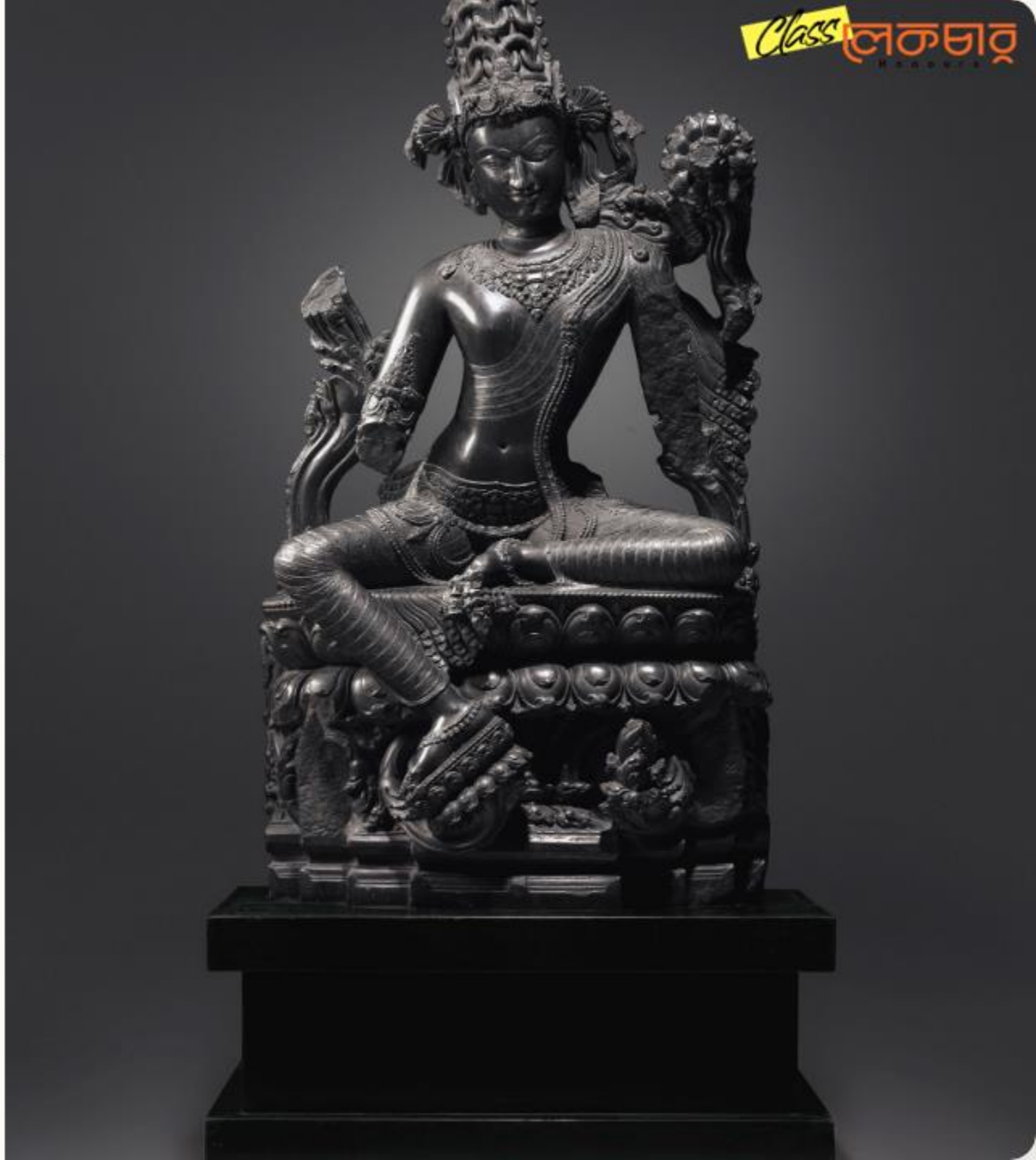

বাংলায় সেন আমল

সামান্ত সেন

সেন বংশের ভিত্তি

- বাংলায় সেন বংশের আদি প্রতিষ্ঠাতা সামন্ত সেন। তবে তিনি কোনো স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেননি।
- পাল সাম্রাজ্যের পতনমুখী ও দুর্বল অবস্থার সুযোগে তিনি স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলেন।
- সেন বংশের প্রথম রাজা হিসেবে সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেনকে মর্যাদা দেওয়া হয়।

বিজয় সেন

- সেন বংশের প্রথম স্বাধীন ও শক্তিশালী সম্রাট। তিনি মূলত শৈব ধর্মের পরম অনুসারী ছিলেন।
- বঙ্গ, রাঢ়, গৌড় ও মিথিলা জয় করে সুদীর্ঘ ৬০ বছরে সমগ্র বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ করেন।
- বিজয়পুর থেকে শাসনকার্য পরিচালনা শুরু করে বিক্রমপুরে দ্বিতীয় রাজধানী গড়ে তোলেন।

বল্লাল সেন

- পিতার প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রেখে মিথিলা ও মগধে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।
- বাংলার সামাজিক ইতিহাসে বিখ্যাত 'কৌলীন্য প্রথা' প্রবর্তনের অন্যতম কারিগর তিনি।
- শাস্ত্রীয় জ্ঞানানুরাগী হিসেবে 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামক দুটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন।

লক্ষ্মণ সেন

- সেন বংশের শেষ শক্তিশালী শাসক এবং মর্যাদাপূর্ণ 'গৌড়েশ্বর' উপাধি ধারণকারী রাজা।
- তাঁর আমলে রাজসভায় কবি জয়দেব ও ধোয়ীর মতো খ্যাতিমান পণ্ডিতদের গৌরবময় সমাগম ছিল।
- ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজির আকস্মিক আক্রমণে শাসনের সমাপ্তি ঘটে।

ঐতিহাসিক সারসংক্ষেপ: পালদের পতনই সেনদের রাজকীয় উত্থানের পথ সুগম করে। কিন্তু দুর্বল উত্তরসূরি, রাজন্যবর্গের পারস্পরিক অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও প্রশাসনিক শিথিলতার ফলে বখতিয়ার খলজির আকস্মিক আক্রমণে বাংলায় দীর্ঘ হিন্দু শাসনের পতন ঘটে।

প্রাচীন বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবন

- **সামাজিক শ্রেণিভেদ:** আর্যদের আগমনে সমাজ চার বর্ণে (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) বিভক্ত হয়। গুপ্ত ও সেন আমলে পেশাভিত্তিক নানা শ্রেণির উদ্ভব ঘটে।
- **আচার-অনুষ্ঠান:** ক্রীড়া, নৌকাবাইচ ও বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব (দুর্গাপূজা, নবান্ন) পালিত হতো।
- **শিক্ষাদীক্ষা:** বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ও ধর্মশাস্ত্রের চর্চা হতো। নারী-পুরুষ একত্রে শিক্ষালাভের সুযোগ পেত।

প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা

- **কৃষি:** কৃষি ছিল অর্থনীতির মূল ভিত্তি। ধান, পাট, আখ, তুলা ছিল প্রধান ফসল। রাজা ছিলেন জমির মালিক।
- **শিল্প:** কার্পাস তুলা দিয়ে মিহি সুতি কাপড় তৈরি হতো, যা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত ছিল। ধাতু ও মৃৎশিল্পে বাঙালিরা দক্ষ ছিল।
- **ব্যবসা-বাণিজ্য:** অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য জল ও স্থলপথে পরিচালিত হতো, যা বাংলার ঐশ্বর্য বাড়িয়েছিল।
- **মুদ্রা:** খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দ থেকে মুদ্রার প্রচলন ছিল। পাল ও সেন আমলে রৌপ্য, তাম্র মুদ্রা ও কড়ির ব্যবহার হতো।

প্রাচীন বাংলার ধর্মীয় জীবন

ধর্মীয় বিশ্বাস ও সহাবস্থান

•**ধর্মীয় বৈচিত্র্য**: প্রাচীন বাংলায় হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, বৈদিক ও পৌরাণিক বিভিন্ন ধর্মের একই সাথে প্রচলন ছিল।

•**বৌদ্ধধর্মের উত্থান-পতন**: পাল রাজাদের আমলে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে, কিন্তু শশাঙ্ক ও সেন আমলে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা বাধার সম্মুখীন হন।

•**হিন্দু ও বৈদিক প্রভাব**: হিন্দুধর্মে বর্ণপ্রথা ও পৌরাণিক ক্রিয়াকলাপের প্রভাব ছিল প্রবল।

•**শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান**: ভিন্ন ধর্মের লোকেরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে মিলেমিশে বসবাস করতো, যা বাংলার ধর্মীয় ইতিহাসের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য।

প্রাচীন বাংলার সাংস্কৃতিক জীবন

১ ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ

অপভ্রংশ থেকে অষ্টম-নবম শতকে বাংলা ভাষার সৃষ্টি ও চর্যাপদের অবিস্মরণীয় জন্ম। পাশাপাশি সংস্কৃত কাব্যে 'রামচরিত', চিকিৎসাবিদ্যায় 'শব্দপ্রদীপ' ও 'লোহপদ্ধতি'র মতো অনন্য সাহিত্যচর্চায় এই যুগ ছিল সমৃদ্ধ ও গৌরবময়।

২ শিল্পকলা, লোকায়ত ও স্থাপত্য কীর্তি

সোমপুর মহাবিহারের মতো ঐতিহাসিক স্থাপত্য, কষ্টিপাথরের জীবন্ত ভাস্কর্য ও পাল চিত্রকলা এবং সমান্তরালে পুতুল, আলপনা, কাঁথা ও মৃৎশিল্পের চিরন্তন লোকায়ত রূপ প্রাচীন বাংলার গভীর শৈল্পিক মননশীলতা প্রকাশ করে।

বিশ্বজোড়া অনন্য প্রভাব ও ঐতিহ্য

প্রাচীন বাংলার এই মননশীল সংস্কৃতি এতটাই উন্নতমানের ছিল যে, একে অনুসরণ করেই নেপাল, তিব্বত, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার ও ইন্দোনেশিয়া সমসাময়িক কালে নিজেদের স্থাপত্য, চিত্রকলা ও ভাস্কর্যরীতিতে নতুনত্ব এনেছিল।

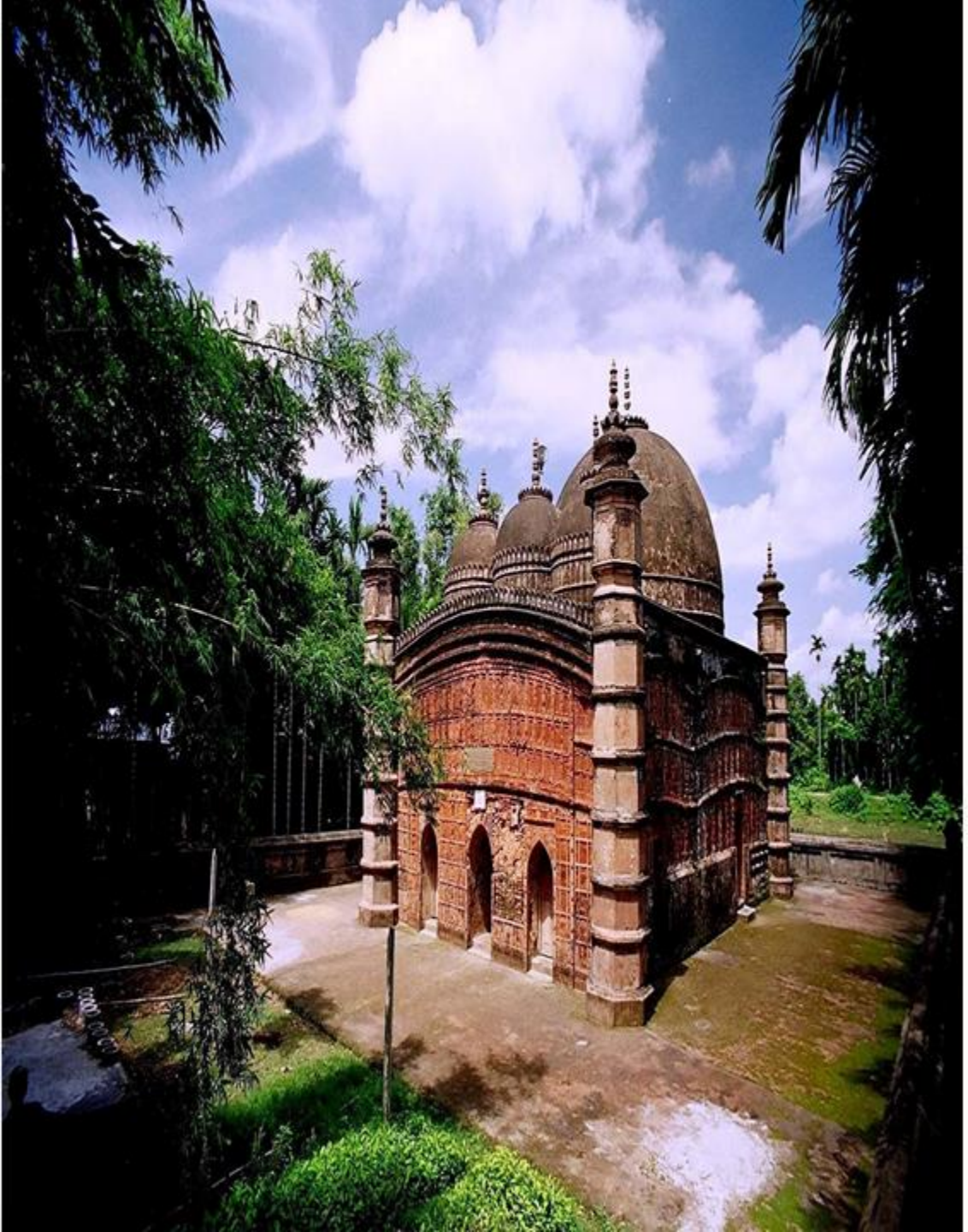

মুসলিম শাসন ও বখতিয়ার খলজি

১ বাংলা বিজয় ও মুসলিম শাসনের সূচনা

১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে বাংলায় মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর এই দুঃসাহসিক বিজয়ের মধ্য দিয়েই বাংলায় মধ্যযুগের সুলতানি আমলের গৌরবময় গোড়াপত্তন ঘটে।

২ শাসনব্যবস্থা ও সমাজ বিনির্মাণ

শাসনভার পরিচালনার সুবিধার জন্য বিজিত রাজ্যকে একাধিক প্রশাসনিক অঞ্চল বা 'ইকতা'-তে বিভক্ত করেন। ধর্মীয় ঐতিহ্য প্রসারে তিনি বাংলায় বহু মসজিদ, মাদ্রাসা ও সুফি সাধকদের জন্য খানকা বা ধর্মীয় আশ্রয়স্থল গড়ে তোলেন।

অদম্য বীরত্ব ও চিরন্তন ঐতিহাসিক গুরুত্ব

উচ্চাভিলাষী ও তীব্র ভাগ্যান্বেষী তুর্কি অশ্বারোহী থেকে শুরু করে বঙ্গবিজেতা রূপান্তর হওয়া বখতিয়ার খলজি ছিলেন এক অসমসাহসী যোদ্ধা। তাঁর এই শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে সমাজে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ মেলবন্ধনে এক নতুন সম্প্রীতি ও গৌরবময় সংস্কৃতির বিকাশ শুরু হয়।

খলজি মালিকদের শাসন ও সুলতান গিয়াসউদ্দিন

১ ক্ষমতারোহণ ও সুদীর্ঘ চোদ্দ বছরের সুশাসন

১২১৩ খ্রিস্টাব্দে হুসামউদ্দিন ইওয়াজ 'সুলতান গিয়াসউদ্দিন' উপাধি নিয়ে বাংলার সিংহাসনে বসেন। বখতিয়ারের পর চরম প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটিয়ে তিনি প্রায় ১৪ বছর বাংলায় এক গৌরবময় ও স্থিতিশীল শাসন কায়েম করেন।

২ জনকল্যাণমুখী কীর্তি ও বিখ্যাত রাজপথ নির্মাণ

তিনি অত্যন্ত প্রজাহিতৈষী শাসক ছিলেন। রাজ্য রক্ষা ও যাতায়াতের সুবিধার্থে দেবকোট থেকে লখনৌর পর্যন্ত সুদীর্ঘ রাজপথ নির্মাণ করেন। গৌড়ের বিখ্যাত জুমা মসজিদসহ বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান তাঁর হাত ধরেই নির্মিত হয়।

৩ মহানুভবতা ও জ্ঞানসাধনার অনন্য পৃষ্ঠপোষকতা

প্রিয়দর্শন ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি সর্বজনপ্রিয় ছিলেন। চেঙ্গিস খাঁর তাণ্ডবে মধ্য এশিয়ার জ্ঞানকেন্দ্রগুলো ধ্বংস হলে, গৃহহারা মুসলিম পণ্ডিত ও সুফিদের তিনি সাদর অভ্যর্থনা ও আশ্রয় দেন; যার ফলে লখনৌতি প্রধান মুসলিম শিক্ষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্রে পরিণত হয়।

অদূরদর্শিতা ও এক ট্রাজিক অবসান

শাসনকালে দুবার অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে রাজধানী লখনৌতি অরক্ষিত রেখে তিনি পূর্ব বাংলায় অভিযান চালান। এই সুযোগে দিল্লির সুলতান ইলতুৎমিশের পুত্র নাসিরউদ্দিন মাহমুদ লখনৌতি আক্রমণ করলে পরিশ্রান্ত সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করতে গিয়ে গিয়াসউদ্দিন পরাজিত হন।

দিল্লি সালতানাতের অধীনে বাংলা ও অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার দ্বন্দ্ব

১. প্রথম পর্ব ও ক্ষমতার লড়াই

১২২৭ খ্রিস্টাব্দে সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজের মৃত্যুর পর বাংলা দিল্লির অধীনে চলে যায়। ইলতুৎমিশের পুত্র নাসিরউদ্দিন মাহমুদ 'মালিক উশ শরক' উপাধিতে বাংলার প্রথম শাসনকর্তা হন। ১২২৯ সালে বল্কা খলজি ক্ষমতা দখল করলে ১২৩০ খ্রি. ইলতুৎমিশ তাকে কঠোর হস্তে দমন করেন।

২. তুঘান খান ও পরবর্তী শাসন

১২৩৬ খ্রি. ইলতুৎমিশের মৃত্যুর পর তুঘরল তুঘান খান লখনৌতি আক্রমণ করে আওর খানকে পরাজিত করেন এবং বিহার ও লখনৌতিকে একই শাসকের অধীনে নিয়ে আসেন। তিনি প্রায় ৯ বছর শাসন করেন। পরে জালালউদ্দিন মাসুদ জানী ও মুঘিসউদ্দিন ইউজবক বাংলার শাসনভার নেন।

৩. আরসালান খান ও আধিপত্য

১২৫৯ খ্রি. সুযোগ বুঝে তাজউদ্দিন আরসালান খান অরক্ষিত লখনৌতি আক্রমণ ও ইজউদ্দিন বলবনকে পরাজিত করে ক্ষমতা নেন। ১২৬৬ খ্রি. তাতার খান দিল্লির নতুন সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের আনুগত্য স্বীকার করলে লখনৌতিতে আবার দিল্লির সুদৃঢ় শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

সুলতান মুঘিসউদ্দিন তুঘরলের উত্থান ও স্বাধীন শাসনকাল

১. তুঘরলের উত্থান ও নারকিল্লা

তুঘরল প্রথম জীবনে ক্রীতদাস হলেও শৌর্য ও বুদ্ধির কারণে দিল্লির সুলতান বলবনের সহকারী শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। পরে তিনি স্বাধীন হয়ে 'মুঘিসউদ্দিন' উপাধি নেন। সেন রাজশক্তির ক্ষমতা রুখতে তিনি সোনারগাঁওয়ের অদূরে শক্তিশালী নারকিল্লা দুর্গ নির্মাণ করেন।

২. উড়িষ্যা অভিযান ও বিরোধ

তুঘরল পূর্ব বাংলায় মুসলিম রাজ্য বিস্তারের পাশাপাশি জাজনগর (উড়িষ্যা) রাজ্য আক্রমণ করে বহু ধনরত্ন ও হাতি হস্তগত করেন। লুণ্ঠিত সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ দিল্লিতে না পাঠিয়ে তিনি লখনৌতির সাধারণ প্রজাদের মাঝে মুক্তহস্তে বিতরণ করেন, যা দিল্লির সুলতান বলবনের মনে ক্ষোভের জন্ম দেয়।

৩. চরিত্র, সুশাসন ও ধর্ম প্রচার

তুঘরল অত্যন্ত উদার, দানশীল ও জনপ্রিয় সুশাসক ছিলেন। দরবেশদের জন্য তিনি একবারে পাঁচ মণ স্বর্ণ দান করেছিলেন। তার সুশাসনে মুগ্ধ হয়ে বহু বিখ্যাত সুফি, দরবেশ ও আউলিয়া বাংলায় আসেন এবং তারা বহু মসজিদ নির্মাণ ও ইসলাম ধর্ম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

বাংলায় বলবনি শাসন ও ফিরোজ শাহের কীর্তি

১. বলবনি শাসন ও বুঘরা খান

সুলতান মুঘিসউদ্দিন তুঘরলের মৃত্যুর পর বলবনের কনিষ্ঠ পুত্র নাসিরউদ্দিন মাহমুদ বুঘরা খান লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং পিতার মৃত্যুর পর স্বাধীন সুলতান হন। তিনি অলস ও ভোগবিলাসী হলেও পিতার রেখে যাওয়া দুজন সুদক্ষ পরামর্শদাতার সাহায্যে রাজ্য পরিচালিত হয়।

২. শামসুদ্দিন ফিরোজ ও রাজ্য বিস্তার

সুলতান রুকনউদ্দিন কাইকাউসের পরে শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ লখনৌতির সিংহাসনে আরোহণ করেন। সোনারগাঁওকে কর্মকেন্দ্র করে ব্রহ্মপুত্র নদ অতিক্রম করে তিনি প্রথমে ময়মনসিংহ এবং পরবর্তীতে সিলেট জেলায় মুসলিম অধিকার বিস্তার করেন, যা তার রাজত্বের এক অনন্য গৌরবময় অধ্যায়।

৩. সুফি সাধকদের অবদান ও প্রচার

তার রাজত্বকালে বাংলায় ইসলাম ধর্ম প্রচার বৃদ্ধি পায়। সাতগাঁও বিজয়ের সাথে শাহ সুফিউদ্দিন এবং সিলেট বিজয়ের সাথে বিখ্যাত সুফি সাধক হযরত শাহজালাল (র.)-এর নাম জড়িত। সুলতান ফিরোজ শাহ সুফিদের ধর্মপ্রচারে প্রত্যক্ষভাবে রাজকীয় সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করেন।

বাংলায় তুঘলক শাসন (১৩২৪–১৩৩৮ খ্রি.)

ত্রিমুখী প্রশাসনিক বিভাগ (১৩২৪ খ্রি.) দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক লখনৌতি আক্রমণ করে বাংলায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং শাসন সুবিধার জন্য রাজ্যটিকে লখনৌতি (উত্তর), সাতগাঁও (দক্ষিণ-পশ্চিম) ও সোনারগাঁও (পূর্ব) - এই ৩টি প্রশাসনিক বিভাগে বিভক্ত করেন।

শাসন পুনর্গঠন ও শর্তাধীন মুক্তি নতুন সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলক বন্দি গিয়াসউদ্দিন বাহাদুরকে মুক্তি দিয়ে সোনারগাঁওয়ে সহ-শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। শর্ত ছিল বাহাদুর তার নামে খোতবা পাঠ ও মুদ্রা জারি করবেন এবং নিজ পুত্রকে প্রতিভূ হিসেবে দিল্লির দরবারে রাখবেন।

স্বাধীনতার প্রয়াস ও চূড়ান্ত পতন গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর দিল্লির আনুগত্য অস্বীকার করে ১৩২৮ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বিদ্রোহ দমনে দিল্লির রাজকীয় বাহিনী দ্রুত অগ্রসর হয় এবং যুদ্ধে তিনি বাহরাম খানের হাতে পরাজিত ও নিহত হন।

ঐতিহাসিক গৌড় (লখনৌতি) অঞ্চলের সুলতানি আমলের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ

ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ (১৩৩৮–১৩৪৯ খ্রি.)

- **স্বাধীন সুলতানি যুগের সূচনা (১৩৩৮ খ্রি.)** -সোনারগাঁওয়ের শাসক বাহরাম খানের মৃত্যুর পর তাঁর বর্মরক্ষক ফখরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং 'সুলতান ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ' উপাধি নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন, যা বাংলায় স্বাধীন সুলতানি আমলের গোড়াপত্তন করে।
- **কদর খানের সাথে সংঘর্ষ ও বিজয়** -লখনৌতির কদর খান সোনারগাঁও অধিকার করলে বর্ষাকালে ফখরুদ্দিন পাল্টা আক্রমণ চালান। কদর খানের সৈন্যদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে ফখরুদ্দিন তাদের নিজের দলে টানেন এবং যুদ্ধে কদর খানকে পরাজিত ও নিহত করেন।
- **রাজ্য বিস্তার ও ইবনে বতুতার আগমন** -তাঁর সময়েই প্রথম চট্টগ্রাম অঞ্চল মুসলমানদের অধীনে আসে এবং তিনি চাঁদপুর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত একটি রাজপথ নির্মাণ করেন। এ রাজত্বকালে (১৩৪৫-৪৬ খ্রি.) বিখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতা বাংলায় ভ্রমণ করেন।

সোনারগাঁওয়ের ঐতিহাসিক পানাম নগরীর প্রাচীন স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ

ইলিয়াসশাহি শাসন: শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ

সমগ্র বাংলার একত্রীকরণ ও সার্বভৌমত্ব

১৩৪২ খ্রি. লখনৌতির সিংহাসন আরোহণের পর তিনি ১৩৫২ খ্রি. সোনারগাঁও জয় করে সমগ্র বাংলাকে একত্রিত করেন এবং ঐতিহাসিক 'শাহ-ই-বাঙ্গালাহ' উপাধি ধারণ করে স্বাধীন সুলতানি মজবুত করেন।

সীমান্ত ও বহির্বিশ্বে রাজ্য বিস্তার

তিনি পশ্চিমে বিহার, চম্পারণ ও কাশী পর্যন্ত সফল রাজ্য বিস্তার করেন। এছাড়া নেপাল (১৩৫০ খ্রি.) এবং ওড়িশায় বড় ধরনের সামরিক অভিযান পরিচালনা করে সামরিক প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন।

একডালা দুর্গে দিল্লির আক্রমণ প্রতিরোধ

ইলিয়াস শাহের উত্থানে বিচলিত হয়ে দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক বাংলা আক্রমণ করলে, ইলিয়াস শাহ বিখ্যাত 'একডালা দুর্গে' আশ্রয় নিয়ে দিল্লির আক্রমণ সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দেন।

প্রাচীন গৌড় লখনৌতি অঞ্চলের ঐতিহাসিক সুলতানি সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ

ইলিয়াসশাহি শাসন: সুলতান সিকান্দর শাহ

ফিরোজ শাহের দ্বিতীয় আক্রমণ প্রতিহতকরণ

পিতার মৃত্যুর পর সিকান্দর শাহ সিংহাসনে বসলে দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক আবারও বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে বাংলা আক্রমণ করেন। সিকান্দর শাহ পুনরায় অভেদ্য একডালা দুর্গে আশ্রয় নেন।

কূটনৈতিক সৌহার্দ্য ও আজীবন শান্তি চুক্তি

দীর্ঘ যুদ্ধ শেষে দিল্লির সুলতান সিকান্দর শাহকে মহামূল্যবান রত্নখচিত মুকুট ও ঘোড়া উপহার পাঠিয়ে সন্ধি করেন। সিকান্দর শাহও দিল্লির সুলতানকে হাতি পাঠিয়ে আজীবন পারস্পরিক উপহার বিনিময়ের চুক্তি করেন।

স্থাপত্যে অমর কীর্তি: আদিনা মসজিদ

তিনি প্রখ্যাত শিল্পানুরাগী ছিলেন। পান্ডুয়ায় অবস্থিত তৎকালীন উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ ও অতি কারুকার্যময় 'আদিনা মসজিদ' (১৩৬৩ খ্রি.) তাঁর অমর কীর্তি, যা মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

পান্ডুয়ার আদিনা মসজিদ ড মধ্যযুগীয় বাংলার মহত্তম মুসলিম স্থাপত্যের অতুলনীয় নিদর্শন

গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ ও প্রথম পর্বের সমাপ্তি (১৩৯০–১৪১৪ খ্রি.)

আইনের শাসন ও অনুপম ন্যায়বিচার

গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ যুদ্ধক্ষেত্রের চেয়ে তাঁর অসাধারণ ন্যায়পরায়ণতা, প্রজাবাৎসল্য এবং সুশাসক চরিত্রের কারণে বিখ্যাত।

আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক ও সাহিত্যিক সম্পর্ক

তিনি পারস্যের প্রখ্যাত কবি হাফিজের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন, মক্কা-মদিনায় পবিত্র মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং চীনা রাজবংশের সাথে সফলভাবে ঐতিহাসিক কূটনৈতিক দূত বিনিময় করেন।

ষড়যন্ত্র ও প্রথম ইলিয়াসশাহি পর্বের সমাপ্তি

১৪১১ খ্রি. জমিদার রাজা গণেশের গভীর ষড়যন্ত্রী ষড়যন্ত্রে এই মহান সুলতানের মৃত্যুর পর তাঁর দুর্বল উত্তরসূরিদের হটিয়ে ১৪১৪ খ্রিস্টাব্দে সাময়িকভাবে এক নতুন হিন্দু রাজবংশের সূচনা হয়।`

সোনারগাঁওয়ে অবস্থিত সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের ঐতিহাসিক সমাধিসৌধ

রাজা গণেশ বংশ ও ইলিয়াসশাহি পুনরুদ্ধার

৩০ বছরের ব্যতিক্রমী পর্ব ও ঐতিহ্যের প্রত্যাবর্তন

গণেশ বংশের রাজত্ব: ভাতুড়িয়ার জমিদার রাজা গণেশ ক্ষমতা দখল করেন। তাঁর পুত্র যদু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে 'জালালউদ্দিন মহম্মদ শাহ' নামে সিংহাসনে বসেন এবং পান্ডুয়া থেকে গৌড়ে রাজধানী স্থানান্তর করেন।

ইলিয়াসশাহি পুনঃপ্রতিষ্ঠা : নাসিরউদ্দিন মাহমুদের মাধ্যমে ইলিয়াসশাহি বংশের গৌরবময় প্রত্যাবর্তন ঘটে। শেষ সুলতান জালালউদ্দিন ফতেহ শাহ হাবসি ক্রীতদাসের হাতে নিহত হলে এই বংশের চূড়ান্ত অবসান ঘটে।

বাংলায় হাবসি শাসন (১৪৮৭–১৪৯৩ খ্রি.)

০১ উত্থান ও প্রথম রাজহত্যা (১৪৮৭ খ্রি.)

ইলিয়াসশাহি আমলে সুরক্ষার জন্য প্রচুর আফ্রিকান হাবসি ক্রীতদাস আনা হয়েছিল। পরবর্তীতে তারা চরম ক্ষমতার অধিকারী হয়ে অবাধ্য হয়ে ওঠে এবং সুলতান ফতেহ শাহকে হত্যা করে 'বরবক শাহজাদা' সিংহাসন দখল করেন।

০২ চারজন অত্যাচারী হাবসি সুলতান

এই সংক্ষিপ্ত রাজত্বকালে ক্রমান্বয়ে ৪ জন হাবসি সুলতান (বরবক শাহজাদা, সৈফউদ্দিন ফিরোজ শাহ, কুতবউদ্দিন মাহমুদ এবং শামসউদ্দিন মুজাফফর শাহ) দেশ শাসন করেন। এদের প্রত্যেকেই নিষ্ঠুর ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত হত্যাকাণ্ডের শিকার হন।

০৩ গণঅভ্যুত্থান ও কলঙ্কময় অধ্যায়ের অবসান

হাবসিদের সীমাহীন অত্যাচার ও অরাজকতায় অতিষ্ঠ হয়ে বাংলার উজির বা প্রধানমন্ত্রী হোসেন শাহের নেতৃত্বে এক তীব্র গণবিদ্রোহ সংঘটিত হয়। সর্বশেষ সুলতান মুজাফফর শাহ নিহত হলে বাংলায় অবসান ঘটে অন্ধকার হাবসি যুগের।

গৌড়ের ঐতিহাসিক ফিরোজ মিনার ও হাবসি স্থাপত্যের এক অনন্য নিদর্শন

৮,০০০+
হাবসি ক্রীতদাসকে প্রশাসনিক উচ্চপদে নিয়োগ

৬ বছর
রক্তক্ষয়ী শাসনকাল (বাংলার ইতিহাসের অন্ধকার যুগ)

হোসেনশাহি বংশ ও বাংলার স্বর্ণযুগ (১৪৯৩–১৫৩৮ খ্রি.)

০১ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ

হোসেনশাহি বংশের প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ সুলতান। তিনি হাবসিদের বিশৃঙ্খল শাসন দূর করে শান্তি ফিরিয়ে আনেন এবং শাসন ক্ষমতায় হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ও উদারতা প্রদর্শন করে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেন।

০২ নসিরউদ্দিন নসরত শাহ

পিতার যোগ্য উত্তরসূরি যিনি মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে বাংলার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখেন। শিল্প ও সংস্কৃতির উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁর সময়েই গৌড়ের বিশ্ববিখ্যাত 'ছোট সোনা মসজিদ' নির্মিত হয়।

০৩ পতন ও আফগান আধিপত্য (১৫৩৮ খ্রি.)

শেষ সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহের অযোগ্যতার সুযোগে জৌনপুরের শের শাহ শুর বাংলায় একের পর এক আক্রমণ শুরু করেন। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে গৌড় অধিকারের মধ্য দিয়ে এই বিখ্যাত রাজবংশের অবসান ঘটে।

গৌড়ের ঐতিহাসিক ছোট সোনা মসজিদ- হোসেনশাহি স্থাপত্যের এক স্বর্ণমুকুট

৪৫ বছর
হোসেনশাহি রাজবংশের স্থায়ী গৌরবময় শাসনকাল

৪ জন
বাংলায় রাজত্বকারী হোসেনশাহি স্বাধীন সুলতান

বাংলায় আফগান শাসন (১৫৩৮–১৫৫৬ খ্রি.)

০১ শের শাহ সুরির উত্থান ও গৌড় বিজয় (১৫৩৮ খ্রি.)

ফরিদ খাঁ তথা শের শাহ সুরি ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলার রাজধানী গৌড় অধিকার করে এ অঞ্চলে স্বাধীন আফগান শাসনের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি মুঘল শক্তিকে প্রতিহত করে নিজের একচ্ছত্র আধিপত্য তৈরি করেন।

০২ মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের পরাজয় ও দিল্লি দখল

১৫৪০ সালে চৌসা ও কনৌজের যুদ্ধে মুঘল সম্রাট হুমায়ুনকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে শের শাহ দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সফল বিজয়ের ফলে বাংলা সাময়িকভাবে দিল্লি সুর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

০৩ সুর রাজবংশের পতন ও মুঘল পুনরুদ্ধার

শের শাহের মৃত্যুর পর তাঁর দুর্বল উত্তরসূরিদের কলহের সুযোগে ১৫৫৬ সালে দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে। সম্রাট হুমায়ুন দিল্লি পুনরুদ্ধার করলে বাংলায় সুর শাসনের অবসান ঘটে।

শের শাহ সুরির অনন্য কীর্তি রোহতাসগড় দুর্গ (Rohtasgarh Fort Entrance)

১৮ বছর

আফগান সুর বংশের সংক্ষিপ্ত কিন্তু প্রভাবশালী শাসনকাল

১৫৩৮ খ্রি.

শের শাহ সুরি কর্তৃক গৌড় বিজয়ের মাধ্যমে বাংলায় আধিপত্য

বাংলায় কররানি বংশের শাসন (১৫৬৪–১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ)

তাজ খান ও সোলায়মান কররানি

১৫৬৪ খ্রি. তাজ খান কররানি সুলতান গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহকে হত্যা করে বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। সোলায়মান কররানি রাজধানী গৌড় থেকে তান্ডায় স্থানান্তর করেন।

বায়জিদ ও দাউদ খানের শাসন

বায়জিদ স্বাধীনতা ঘোষণা করলেও ষড়যন্ত্রের শিকার হন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা দাউদ খান কররানি মুঘল সম্রাট আকবরের প্রবল বিরুদ্ধাচরণ শুরু করেন।

রাজমহলের যুদ্ধ ও অবসান

১৫৭৬ খ্রি. রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ খান কররানি পরাজিত ও নিহত হলে স্বাধীন সুলতানি শাসনের চূড়ান্ত অবসান ঘটে।

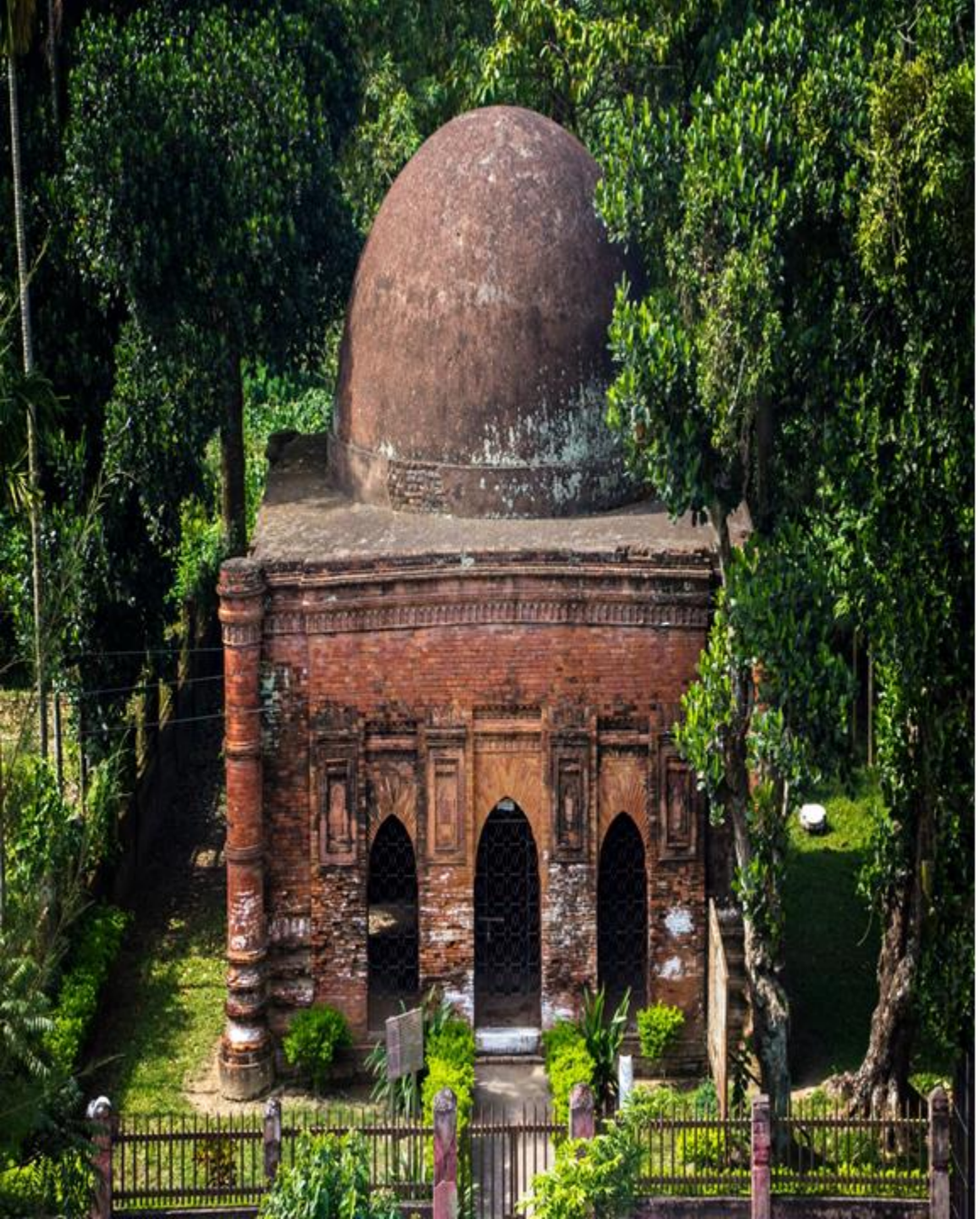

বারোভূঁইয়াদের বীরত্ব ও মুঘল প্রতিরোধ

বারোভূঁইয়াদের উত্থান

দাউদ খানের পতনের পর ঈসা খানের নেতৃত্বে স্বাধীন জমিদারগণ 'বারোভূঁইয়া' নামে মুঘলদের প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।

মুসা খান ও প্রতাপাদিত্য

ঈসা খানের পুত্র মুসা খান এবং যশোরের প্রতাপাদিত্য নৌযুদ্ধে মুঘলদের বিরুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করেন, তবে শেষপর্যন্ত পরাজিত হন।

অন্যান্য ভূঁইয়াগণ

চাঁদ রায়, কেদার রায়, অনন্ত মাণিক্য এবং খাজা ওসমান খান মুঘলদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সময় লড়াই চালিয়ে যান।

বারোভূঁইয়া দমন ও সুবাদারি শাসন

সুবাদার শাহবাজ খান ও মানসিংহ

শাহবাজ খান এবং রাজা মানসিংহ সুবাদার হিসেবে মুঘল ক্ষমতা বিস্তারে ভূমিকা রাখেন। মানসিংহ ঈসা খানের সাথে যুদ্ধচুক্তি করেন।

সুবাদার ইসলাম খান ও ঢাকা

সুবাদার ইসলাম খান ১৬১০ খ্রি. রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তর করেন এবং এর নামকরণ করেন 'জাহাঙ্গীরনগর'।

অন্যান্য সুবাদার

কাসিম খান এবং ইব্রাহিম খান ফতেহ জঙ্গ পর্তুগিজ দস্যুদের দমন ও প্রশাসনিক সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সফল হন।

মুঘল সুবাদারদের কীর্তি ও বাংলার ঐশ্বর্য

শাহজাদা সুজা ও মিরজুমলা

শাহজাদা সুজা ইংরেজদের বিনা শুল্কে বাণিজ্যের সুযোগ দেন। মিরজুমলা কুচবিহার ও আসামকে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

সুবাদার শায়েস্তা খান

মগ ও আরাকানি দস্যুদের বিতাড়িত করে শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম দখল করেন। তার আমলে টাকায় ৮ মণ চাল পাওয়া যেত।

আজিমুদ্দীন ও কলকাতা

আজিমুদ্দীনের শাসনামলে ইংরেজরা সুতানটি, কলকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রাম ক্রয় করে কলকাতা শহরের ভিত্তি স্থাপন করে।

বাংলার নবাবি শাসন: সূচনা ও সংস্কার

মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ব সংস্কার

১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলী খান বাংলার প্রথম নবাব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি 'খাসজমি' প্রথার মাধ্যমে রাজস্ব আদায় সংগঠিত করেন এবং মুর্শিদাবাদকে বাংলার রাজনৈতিক কেন্দ্রে পরিণত করেন। তার শাসন বাংলাকে এক আধা-স্বাধীন সত্তা প্রদান করে।

সুজাউদ্দিন ও সরফরাজ খান

মুর্শিদকুলীর পর সুজাউদ্দিন মুহম্মদ খান ১৭২৭ সালে ক্ষমতায় আসেন। তিনি জনদরদি শাসক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তবে তার পুত্র সরফরাজ খানের শাসনামলে অভ্যন্তরীণ কোন্দল শুরু হয়, যা আলিবর্দী খানের উত্থানের পথ প্রশস্ত করে।

আলিবর্দী ও সিরাজউদ্দৌলা

গিরিয়ার যুদ্ধ ও নববি শক্তির উত্থান

১৭৪০ সালে আলিবর্দী খান গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজকে পরাজিত করে ক্ষমতা দখল করেন। তিনি মারাঠা দস্যু ও অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ কঠোরভাবে দমন করে বাংলার স্থিতি রক্ষা করেছিলেন।

পলাশির যুদ্ধ ও ইতিহাসের বাঁক

১৭৫৬ সালে সিরাজউদ্দৌলা মাত্র ২৩ বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে সংঘাত ও মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় ১৭৫৭ সালের পলাশির যুদ্ধে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়।

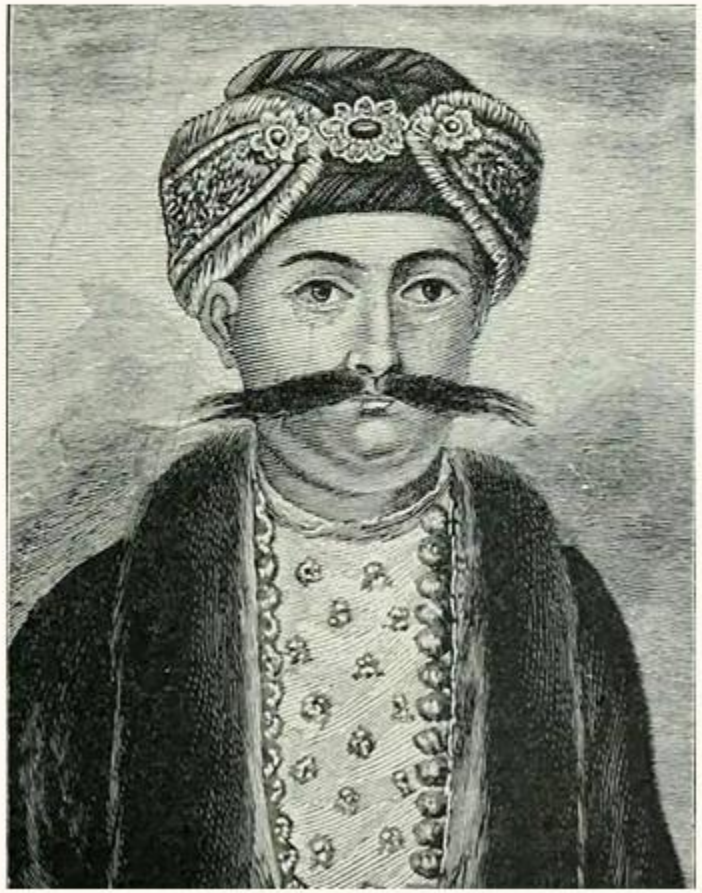

Class লেকচার Honours

মুসলিম বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি

উর্বর কৃষি

বাংলার উর্বর ভূমি ছিল অর্থনীতির মূল ভিত্তি। ধান, তুলা, ইক্ষু ও রেশমের প্রাচুর্য বাংলাকে বিশ্বের অন্যতম সচ্ছল প্রদেশে পরিণত করেছিল।

বিশ্বখ্যাত মসলিন

ঢাকার মসলিন ছিল বিশ্বখ্যাত। এখানকার বস্ত্রশিল্পের মান এত উন্নত ছিল যে তা রোম থেকে চীন পর্যন্ত রপ্তানি হতো এবং প্রচুর স্বর্ণ আহরণ করত।

বাণিজ্য ও মুদ্রা

চট্টগ্রাম ও সোনারগাঁও বন্দর বিশ্ব বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। শের শাহের রৌপ্যমুদ্রা (রুপিয়া) অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা ও প্রাণ ফিরিয়ে আনে।

"ইবনে বতুতার মতে, সারা বিশ্বের মধ্যে বাংলাতেই সবচেয়ে সস্তায় দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যেত।"

বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন

শ্রেণিবিভক্ত সমাজ ও সম্প্রীতি

মুসলিম সমাজ অভিজাত, মধ্যবিত্ত ও সাধারণ শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। হিন্দু সমাজে বর্ণপ্রথা কঠোর থাকলেও উৎসবে হিন্দু-মুসলমান একে অপরের সহযোগী ছিল।

পোশাক ও খাদ্যাভ্যাস

- **খাদ্য**: মাছ, ভাত, শাকসবজি ও বাহারি পিঠা ছিল প্রধান খাবার।
- **পোশাক**: ধুতি, লুঙ্গি, শাড়ি ও আংটি-ব্রেসলেট ছিল সাধারণের ভূষণ।
- **উৎসব**: ঈদুল ফিতর, আকিকা, বিসর্জন ও ষষ্ঠী পূজা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত হতো।

১.২.১৭ মুসলিম শাসনামলে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবন

সাহিত্য ও শিক্ষা

মাদ্রাসা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধর্মীয় ও মানবিক শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। সাহিত্য ও শিক্ষায় স্থানীয় ও বিদেশি প্রভাবের মিশ্রণ ঘটেছিল।

সংগীত ও পারফরম্যান্স

কিরাত, নাজম ও লোকসংগীত সমাজে আনন্দ ও নৈতিক শিক্ষার উৎস হিসেবে কাজ করতো।

চিত্রকলা ও কারুশিল্প

পাত্রশিল্প, টেরাকোটা ও হস্তশিল্পে জ্যামিতিক ও উদ্ভিদ নকশা ব্যবহৃত হতো, যা নান্দনিক চেতনার প্রতীক ছিল।

স্থাপত্য ও নগরায়ণ

ইসলামিক নকশা ও স্থানীয় কারুকার্যের সমন্বয়ে মসজিদ, মাদ্রাসা ও নগরায়ণ গড়ে ওঠে। টেরাকোটা ও ছাদশিল্প ছিল বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

সাংস্কৃতিক প্রভাব

সংস্কৃতি সমাজের নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় আচরণে গভীর ও স্থায়ী প্রভাব ফেলত।

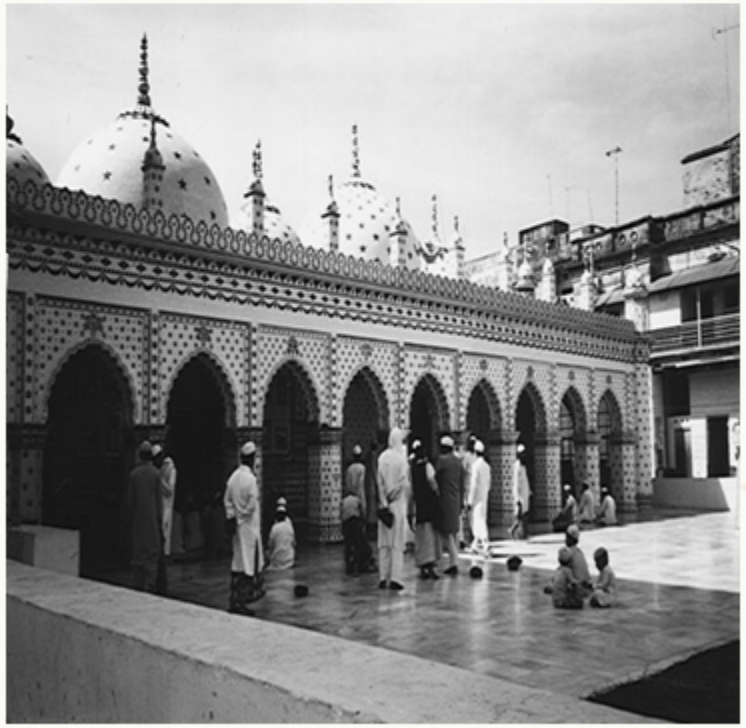

১.২.১৮ মুসলিম শাসনামলে বাংলার ধর্ম

ইসলামি প্রতিষ্ঠান ও চর্চা

মসজিদ ও মাদ্রাসা ছিল নৈতিক শিক্ষার মূল কেন্দ্র। ইসলামি আইন সামাজিক ও পারিবারিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করতো।

শিক্ষা ও সাহিত্য

কুরআন, হাদিস ও ইসলামি সাহিত্য নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিস্তারে প্রধান ভূমিকা পালন করতো।

আচার অনুষ্ঠান ও উৎসব

ঈদ, পূজা ও বিভিন্ন সামাজিক উৎসব সমাজে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও নৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করতো।

চেতনা ও নৈতিক মূল্যবোধ

ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে সততা, ন্যায়বিচার ও সামাজিক শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, যা স্থিতিশীলতা বজায় রাখতো।

অন্যান্য ধর্মের সহাবস্থান

শাসক শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় তাদের ধর্মীয় আচার ও উৎসব পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতো।

১.২.১৯ সুলতানি আমলে বাংলার সামাজিক অবস্থা

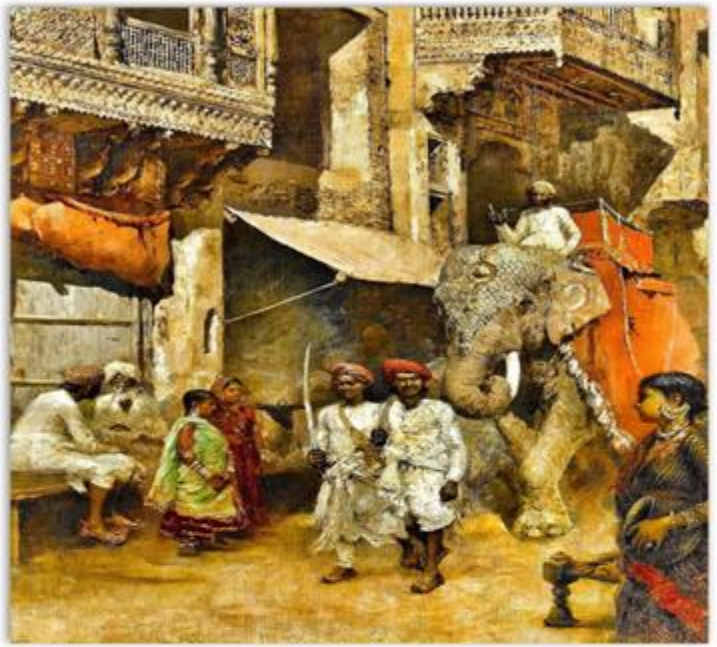

সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস

সুলতান, উলামা, অভিজাত ও জমিদারদের পাশাপাশি কৃষক ও শ্রমজীবী শ্রেণির সমন্বয়ে সমাজ গঠিত ছিল।

সাম্প্রদায়িক সহাবস্থান

মুসলিম ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সহনশীলতা সামাজিক স্থিতি নিশ্চিত করেছিল।

নগর ও নারীসমাজ

নগরগুলো ছিল বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র। নারীরা গৃহকেন্দ্রিক হলেও অর্থনীতি ও হস্তশিল্পে অপরিহার্য ভূমিকা রাখতেন।

শিক্ষা ও শিল্পকলা

মক্তব-মাদ্রাসা ও টোলের মাধ্যমে জ্ঞানচর্চা এবং স্থাপত্য ও সাহিত্যচর্চায় এক সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে ওঠেছিল।

গ্রামীণ সমাজ ও কৃষি

কৃষি ছিল অর্থনীতির মেরুদণ্ড। গ্রামভিত্তিক যৌথ পরিবার ও মৌসুমি উৎসব সামাজিক ঐক্যের উৎস ছিল।

সুলতানি আমলে বাংলার অর্থনীতি

- **কৃষিভিত্তিক সমাজ:** সুলতানি আমলে বাংলা ছিল কৃষিপ্রধান। ধান, তুলা, আখ, এবং বিভিন্ন মসলা উৎপাদিত হতো যা স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা মেটাতো।
- **বস্ত্রশিল্পের উৎকর্ষ:** ঢাকা কেন্দ্রিক মসলিন বিশ্ববিখ্যাত ছিল। আমির খসরুর বর্ণনামতে, মসলিন অত্যন্ত মসৃণ ও উজ্জ্বল ছিল।
- **বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি:** চট্টগ্রাম, সোনারগাঁও ও সাতগাঁও বন্দর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র ছিল। ইবনে বতুতা সোনারগাঁও বন্দর থেকে বাণিজ্যের বিস্তারের প্রমাণ দিয়েছেন।
- **অন্যান্য শিল্প:** জাহাজ নির্মাণ, কারুকার্য ও কুটিরশিল্পের প্রসার ঘটেছিল। স্বর্ণ, রৌপ্য ও পাথরের শিল্পকর্মের বিশেষ প্রচলন ছিল।

সুলতানি আমলে বাংলার ধর্মীয় অবস্থা

- **সামাজিক সহাবস্থান:** সুলতানি আমলে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক। শাসকরা ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছিলেন।
- **মুসলিম সমাজ:** সমাজ ছিল চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত- শাসক, অভিজাত, মধ্যবিত্ত ও সাধারণ শ্রেণি। আলেম-ওলামাদের বিশেষ সম্মান ছিল।
- **হিন্দু সমাজ:** ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র- এই বর্ণপ্রথার ভিত্তিতে হিন্দু সমাজ পরিচালিত হতো এবং তারা স্বাধীনভাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতো।
- **সুফিবাদ ও ভক্তিবাদ:** হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মতো সুফি-দরবেশদের আগমনে সুফিবাদ ও শ্রীচৈতন্যের হাত ধরে ভক্তিবাদের বিকাশ ঘটে, যা বাংলা ধর্মীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে ইসলাম ধর্মগ্রহণেও ভূমিকা রাখে।

মুসলিম সমাজে হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব

শ্রেণিবৈষম্য ও বর্ণপ্রথা

হিন্দুসমাজের প্রভাবে সুলতানি আমলের মুসলিম সমাজেও শ্রেণিবৈষম্য দেখা দেয়। তুর্কি, পাঠান, সৈয়দ ও শেখগণ নিম্নশ্রেণির মুসলমানদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা থেকে বিরত থাকতেন। উচ্চ সরকারি পদে কেবল অভিজাত বংশীয়দেরই নিয়োগ দেওয়া হতো।

রাজকীয় আচার ও জীবনব্যবস্থা

হিন্দু কর্মকর্তাদের প্রভাবে অনেক মুসলিম শাসক দরবারে হিন্দু রীতি ও আচার অনুকরণ করেন। রোগমুক্তির পর রাজার মাথায় স্বর্ণ-রৌপ্য ঢেলে তা দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ এবং দরবারে পদমর্যাদা অনুযায়ী বসার আসন বিন্যাস সরাসরি হিন্দু ধারণা থেকে নেওয়া হয়েছিল।

ধর্মীয় আচরণ ও পিরবাদ

মুসলিম পণ্ডিত ও দরবেশগণ হিন্দুদের বেদান্ত এবং যোগশাস্ত্র দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হন। হিন্দু ঐতিহ্যের গুরু-শিষ্য আধ্যাত্মিক ধারা থেকেই মুসলিম সুফি সাধকদের খানকার পির ও মুরিদ প্রথার সূচনা হয়। এছাড়া পিরের মাজারে মানত করার প্রচলনও হিন্দু সংস্কৃতিরই ফল।

সামাজিক রীতিনীতি ও প্রশাসন

শবেবরাত, আকিকা, বিসমিল্লাহখানি এবং বিবাহে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের সাথে যৌতুক প্রথাও মুসলমানদের মাঝে ঢুকে পড়ে। এছাড়াও রাজস্ব ও অর্থ প্রশাসন পরিচালনার মূল কাঠামো, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং রণকৌশলে এদেশীয় হিন্দু রীতির ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

হিন্দুসমাজে মুসলিম সংস্কৃতির প্রভাব

সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি

অবরোধ ও পর্দার প্রথা

মুসলিম শাসন সুদৃঢ় হওয়ার ফলে এদেশীয় হিন্দুসমাজে পর্দার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। সম্ভ্রান্ত মহিলাদের শরীর আবৃত রাখা ও পর্দা পালনের প্রভাব প্রবল হয়ে ওঠে।

পালকির ব্যবহার ও বিবাহ

অভিজাত হিন্দু নারীদের জন্য ঢাকা বা সুরক্ষিত পালকিতে যাতায়াতের মুসলিম সংস্কৃতির প্রচলন শুরু হয়। এছাড়া সমাজে বাল্যবিবাহের প্রবণতাও বৃদ্ধি পায়।

সামাজিক আচার ও বিনোদন

বিলাসী পোশাক ও চালচলন

হিন্দু রাজা ও সামন্তরা মুসলমান সুলতান ও অভিজাতদের অনুকরণে জমকালো ও বিলাসবহুল পোশাক পরিধান এবং আভিজাত্য প্রকাশ করতে শুরু করেন।

খাদ্যাভ্যাস ও চিত্তবিনোদন

মুসলমানদের বিলাসী খাদ্য ও বিশেষ রন্ধন প্রণালি হিন্দুসমাজে স্থান পায়। এছাড়াও ধনী হিন্দুরা পাশা খেলা, জুয়া, মদ্যপান ও শিকারের মতো মুসলিম রাজকীয় অভ্যাসে লিপ্ত হয়।

শিল্প, সংগীত ও সাহিত্য

ভাষায় ফারসি প্রভাব

হিন্দুদের প্রাত্যহিক ভাষা ও বাংলা সাহিত্যে প্রচুর ফারসি শব্দের সংমিশ্রণ ঘটে। ফারসি সাহিত্যের শৈলী হিন্দুদের রচনাতেও প্রভাব বিস্তার করে।

সংগীত ও সামরিক দক্ষতা

মুসলিম বাদ্যযন্ত্র এবং কাওয়ালি সংগীতের প্রভাবে হিন্দু সংগীতধারা প্রভাবিত হয়। পাশাপাশি যুদ্ধের কলাকৌশল ও পারদর্শিতা অর্জনে হিন্দুরা মুসলমানদের অনুসরণ করে।

সাহিত্য ও শিক্ষা কাঠামোর পুনর্জাগরণ

সাহিত্যের অভূতপূর্ব বিকাশ

রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা: সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ এবং আলাউদ্দিন হোসেন শাহ বাংলা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে অনবদ্য ও ঐতিহাসিক অবদান রাখেন।

অনুবাদ সাহিত্য: এ যুগে আরবি, ফারসি ও সংস্কৃত ভাষার মহৎ গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনূদিত হয়। বিশেষত সংস্কৃত মহাকাব্য ও পৌরাণিক উপাখ্যানের অনুবাদ শুরু হয়।

কালজয়ী সৃষ্টিসমূহ: এ যুগেই কৃত্তিবাসের বিখ্যাত "রামায়ণ" এবং মালাধর বসুর "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" কাব্য রচিত হয় যা বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

নব্যন্যায়ের ভিত্তি: নবদ্বীপে নব্যন্যায় সংঘের প্রতিষ্ঠা ছিল এ যুগের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ও তাত্ত্বিক সাংস্কৃতিক ঘটনা।

শিক্ষা কাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ

শিক্ষার গুরুত্ব: সুলতানগণ শিক্ষার প্রসারে প্রভূত মনযোগী ছিলেন। সমাজে শিক্ষক শ্রেণী অত্যন্ত উঁচু মর্যাদা ও শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শিক্ষার কেন্দ্রসমূহ: মুসলমানদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল মক্তব এবং উচ্চশিক্ষার জন্য সুসংগঠিত মাদ্রাসা গড়ে তোলা হয়।

ধর্মীয় ও নারীশিক্ষা: সাধারণ পরিবারে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক হলেও সমাজব্যবস্থায় নারীশিক্ষার জন্য কোনো বাধ্যতামূলক নিয়মাবলি ছিল না।

গ্রন্থাগার ও রাজদরবার: সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ, আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ও নসরত শাহের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় বহু বিদ্যালয়, পাঠাগার ও পণ্ডিতদের সমাবেশ ঘটে।

ললিতকলা ও অনন্য স্থাপত্যরীতি

হস্তলিপি ও চিত্রশিল্পের গতিধারা

আরবীয় ও পারসিক ধাঁচের শিলালিপি এবং স্বর্ণ-রৌপ্য মুদ্রার নকশায় হস্তলিপিবিদ্যার (Calligraph) চরম উৎকর্ষ দেখা যায়। ধর্মীয় কারণে চিত্রশিল্প বিকশিত না হলেও ইমারত অলংকরণে লতাপাতা ও নকশায় শিল্পীরা স্বাধীন ছিলেন। চীনা পর্যটকরা একাধিক পেশাদার শিল্পীর উল্লেখ করেছেন।

অনন্য স্থাপত্যরীতি ও নির্মাণশৈলী

এ যুগের স্থাপত্যে এদেশীয় ও মুসলিম রীতির অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটে। ইটের আধিক্য, খিলান সমৃদ্ধ সৌধ, ছোট স্তম্ভ এবং বাঁকানো কার্নিশের ব্যবহার ছিল অনন্য। ঐতিহ্যবাহী বাঁশের দোচালা-চৌচালা কুটিরের প্রভাব ইমারতের ছাদে সুস্পষ্ট রূপ পায়।

ঐতিহাসিক স্থাপত্যের জীবন্ত উদাহরণ

আদিনা মসজিদ, ষাটগম্বুজ মসজিদ, লোটন ও ছোট সোনা মসজিদ, কদম রসুল, ত্রিবেণীর জাফর খান গাজির সমাধি, জালালউদ্দিনের সমাধি এবং দাখিল দরওয়াজা এ যুগের স্থাপত্যের অমর ও বিশ্বনন্দিত নিদর্শন।

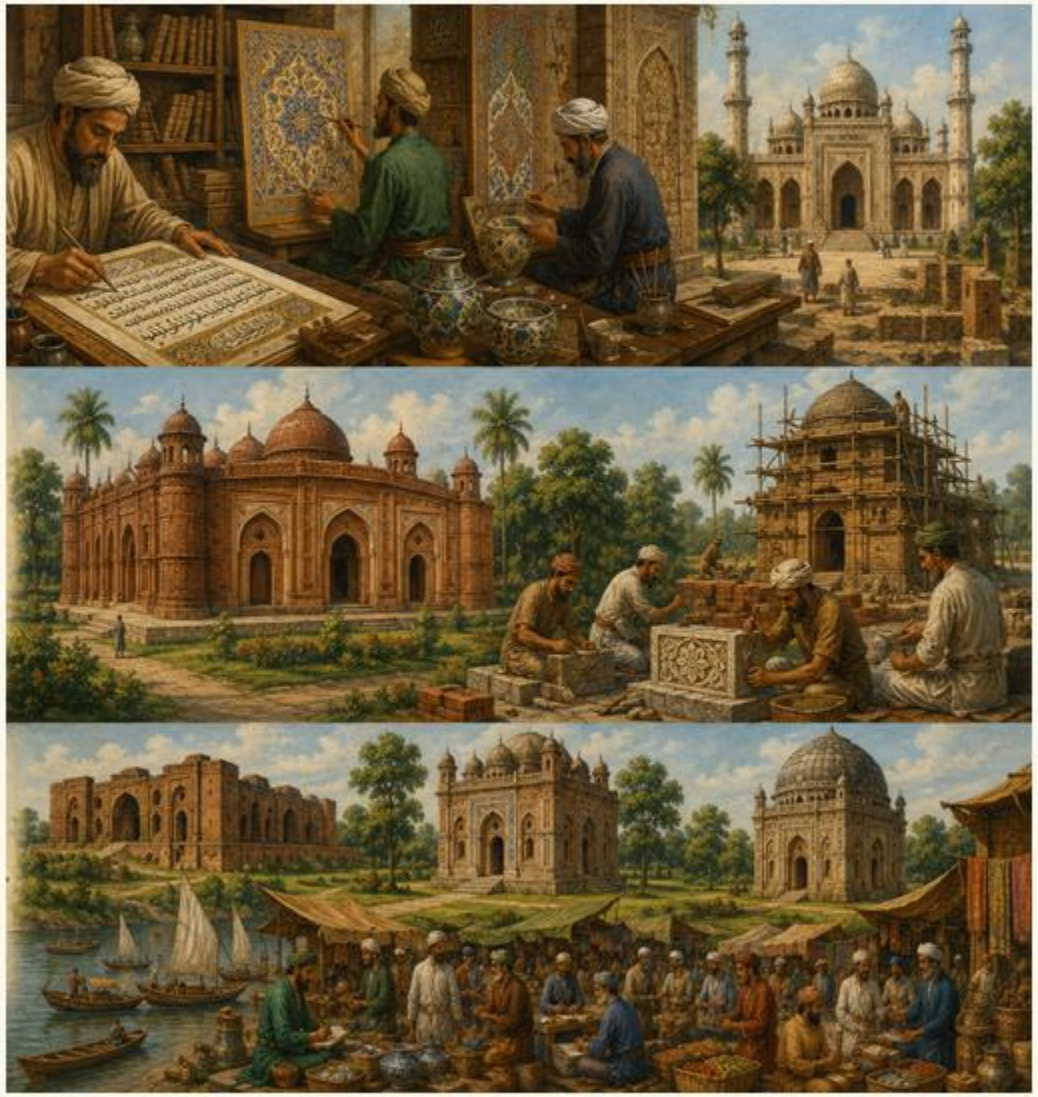

ঐতিহাসিক পটভূমি ও সার্বভৌমত্ব

গৌরবের স্বর্ণশিখর

স্বাধীন সুলতানি শাসনামলে বাংলা সার্বিক দিক দিয়ে উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হয়। এই দীর্ঘ শাসনকালে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলার স্থানীয় রীতি ও মুসলিম রীতির মিশ্রণে এক চমকপ্রদ ও অনন্য স্থাপত্যশৈলীর জন্ম হয় যা অত্যন্ত রাজকীয় ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল।

সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ, নসরত শাহ, গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ সহ মহান শাসকগণ তাদের রাজত্বকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে এবং ধর্মীয় পুণ্য অর্জনের স্পৃহায় অগণিত ইমারত নির্মাণ করেছিলেন।

কালের বিবর্তন ও ধ্বংসাবশেষ

স্থাপত্যগুলো মূলত শাসক ও স্থপতিদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য ধারণ করে দীর্ঘ শতাব্দী ধরে সগৌরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাংলার আবহাওয়া ও বহিরাগত শক্তির আগ্রাসনে অনেক অনবদ্য স্থাপত্য কালের স্রোতে চিরতরে বিলীন হয়ে গিয়েছে।

তবে অবশিষ্টাংশ প্রাচীন নিদর্শনগুলো আজও ধ্বংসাবশেষের মধ্য থেকে গৌরবোজ্জ্বল মধ্যযুগীয় বাংলার শিল্পদক্ষতা এবং উন্নত প্রযুক্তিগত সামর্থ্য প্রকাশ করে আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে চলেছে।

বাংলার প্রধান চারটি ঐতিহাসিক মসজিদ

আদিনা মসজিদ

১৩৬৯ খ্রি.

পাণ্ডুয়া হতে ১ মাইল উত্তরে অবস্থিত সুলতানি আমলের বাংলার বৃহত্তম মসজিদ। সুলতান সিকান্দার শাহ এটি নির্মাণ করেন। এর দৈর্ঘ্য ৫৭৭ ফুট, প্রস্থ ২৮০ ফুট এবং এতে ৫৭৮টি গম্বুজ রয়েছে। এর উত্তর পাশে সুলতানের সমাধি অবস্থিত।

ষাটগম্বুজ মসজিদ

৭৭ গম্বুজ

পির খান জাহান আলি বাগেরহাটে নির্মাণ করেন যা বাংলার অন্যতম বৃহত্তম মসজিদ। সুলতান ইলিয়াস শাহের রাজত্বকালে নির্মিত এই মসজিদের গম্বুজ সংখ্যা ৮১টি। এটি খান জাহানের সমাধি থেকে ৩ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত এবং কালের সাক্ষী হয়ে দণ্ডায়মান।

বড় সোনা মসজিদ

৪৪ গম্বুজ

গৌড়ের নবাবগঞ্জ জেলায় অবস্থিত। সুলতান আলাউদ্দিন খলজি আসাম জয়ের স্মরণে কাজ শুরু করেন ও নসরত শাহ শেষ করেন। ১২টি প্রবেশদ্বার থাকায় এটি 'বারোদুয়ারি' নামেও পরিচিত। পাথর ও ইটের উপর সোনালি রঙের গিলটি নকশার কারণে এর এই নামকরণ।

ছোট সোনা মসজিদ

হোসেন শাহী আমল

গৌড়ের চাঁপাইনবাবগঞ্জের ফিরোজাবাদ গ্রামে অবস্থিত। সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের আমলে ওয়ালি মোহাম্মদ নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এটি নির্মাণ করেন। এর অনন্য সোনালি রঙের ছোট ছোট গিলটির সৌন্দর্যের কারণেই এর নাম ছোট সোনা মসজিদ। পাশে নির্মাতার সমাধি রয়েছে।

অন্যান্য ঐতিহাসিক ইমারত ও কীর্তিসমূহ

একলাখি মসজিদ ১ গম্বুজ

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মালদা জেলার পান্ডুয়ায় অবস্থিত ১৫ শতকের একলাখি মসজিদ (মূলত একলাখি সমাধিসৌধ) বাংলার প্রথম স্থানীয় মুসলিম শাসক সুলতান জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহ-এর মাজার। এটি নির্মাণে তৎকালীন এক লাখ টাকা খরচ হয়েছিল বলে লোকমুখে এর নাম একলাখি হয়। এই মাজারে জালালউদ্দীন, তাঁর স্ত্রী এবং পুত্র সুলতান শামসউদ্দীন আহমদ শাহের সমাধি রয়েছে।

বাবা আদমের মসজিদ ১৪৮৩ খ্রি.

মুন্সীগঞ্জ জেলার রামপালে দুটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের ওপর এটি নির্মিত হয়। এটি মূলত মালিক কাফুর ফতেহর রাজত্বকালে সুশোভিত ইষ্টকরীতিতে নির্মাণ করা হয়েছিল।

কদম রসুল ভবন ১৫৩১ খ্রি.

গৌড়ে মহানবি (সা.)-এর পবিত্র পদচিহ্নের স্মৃতি রক্ষা ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য সুলতান নসরত শাহ এটি নির্মাণ করেন। এর প্রধান প্রকোষ্ঠে কালো কারুকার্যময় মর্মরবেদির ওপর মহানবির পদচিহ্ন সংবলিত একটি পবিত্র প্রস্তরখণ্ড স্থাপিত।

লোতন মসজিদ ১৪৭৫ খ্রি.

বিবি লোটন (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মীরাবাঈ নামে রাজ নর্তকী ছিলেন) গৌড় শহরের দক্ষিণে এটি নির্মাণ করেন। এর কারুকার্য ছিল অনন্যসাধারণ ও অতুলনীয়। বাহ্যিক ইমারতটি সম্পূর্ণ পোড়ামাটির ইটের সূক্ষ্ম গাঁথুনি দ্বারা নির্মিত।

চিকা মসজিদ ১৫০৪ খ্রি.

সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ গৌড়ে একলাখি মসজিদের অনুকরণে এটি নির্মাণ করেন। ভেতরে বাদুড় (চিকা) বাস করায় এই নামকরণ। অনেকেই ধারণা করেন এটি মূলত একটি বিশাল বন্দিশালা ছিল, যেখানে মন্ত্রী সনাতনকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল।

সমাধি ও কোতোয়ালি তোরণ ১৪১০ খ্রি.

আজম শাহের সমাধি: সোনারগাঁওয়ে অবস্থিত সুলতানি স্থাপত্যের নিদর্শন। এর পাশে ৫টি মাজার ও ৫টি মসজিদ থাকায় একে 'পাঁচপিরের দরগাহ'-ও বলা হয়।

কোতোয়ালি দরজা: গৌড় নগরীর দক্ষিণপ্রান্তে মাহদিপুরে নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ কর্তৃক নির্মিত প্রতিরক্ষামূলক তোরণদ্বার যা বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত।

সুলতানি স্থাপত্যরীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

ছাদ ও গম্বুজরীতি

বহুমাত্রিক গম্বুজরীতি

স্থাপত্যের প্রধান অলংকার ছিল গম্বুজ। এখানে ১-গম্বুজ, বহু-গম্বুজ, খিলান করা ধনুকের ন্যায় বক্র কেন্দ্রীয় ছাদ এবং সম্মুখে বারান্দাসহ নানা বিন্যাস লক্ষণীয়। (উদা: ষাটগম্বুজ, আদিনা, বড় ও ছোট সোনা মসজিদ, তাঁতি মসজিদ ও লালবাগ মসজিদ)।

ঐতিহ্যবাহী চালারীতি

বাংলার চিরচেনা বাঁশ ও খড়ের কুটিরের দোচালা ও চৌচালা চালারীতি মুসলিম ইমারতে প্রথম আত্তীকরণ করা হয়। খান জাহানের সমাধি, ষাটগম্বুজ মসজিদ ও আজম শাহের সমাধিসৌধে এই চৌচালা গঠনরীতির প্রভাব বিদ্যমান।

প্রকৌশল ও অনন্য গঠন

খান জাহানি রীতি (১৪৫৯ খ্রি.)

নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের আমলে বিকশিত এই রীতি বাগেরহাটের ইমারতগুলোতে সুস্পষ্ট। বৃত্তাকার কোণার বুরুজ, বৃত্তাকার প্রাচীর এবং ঢালু দেওয়ালের সমন্বয় এই রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য (উদা: বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ)।

উন্নত খিলান ও সুউচ্চ মিনার

ইট-পাথর সুশৃঙ্খলভাবে বক্রাকারে সাজিয়ে খিলান তৈরি হতো (উদা: ১৫২৬ খ্রি. নসরত শাহ নির্মিত বড় সোনা মসজিদের ১১টি খিলানপথ)। মিনার রীতি ছিল সাধারণ অঙ্গ; মসজিদ ও তোরণের কোণায় গোলাকার বা বন্ধাকার মিনার শোভা পেত (উদা: ফিরোজ মিনার)।

উপকরণ ও অলংকরণ

টেরাকোটা বা পোড়ামাটি শিল্প

কাদামাটির ফলকে নান্দনিক নকশা খোদাই করে পুড়িয়ে ইটের দেওয়ালে আচ্ছাদন করার দেশীয় শৈলী এটি। গুমতি দরওয়াজা, দাখিলি দরওয়াজা, তাঁতিপাড়া মসজিদ ও মেহেদিপুরের গুনমন্ত মসজিদে এই কারুকার্য বিশেষভাবে দৃশ্যমান।

ইষ্টকরীতি (লাল ইটের শিল্প)

বাংলায় পাথর সহজলভ্য না হওয়ায় সুলতানি আমলের ভিত্তি ছিল পোড়ামাটির লাল ইটের ব্যাপক প্রচলন। পোড়ামাটির কারুকার্যময় লাল ইটের সুচারু ব্যবহার বাংলার সুলতানি মুসলিম স্থাপত্যকে বিশ্ব দরবারে এক অনন্য স্বকীয়তা দিয়েছে।

মুঘল আমলে সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস ও সাম্প্রদায়িক সহাবস্থান

👥 সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস ও স্তরসমূহ

মুঘল বাংলার সমাজ ছিল বহুস্তরীয় ও জটিল। এই শ্রেণি কাঠামো সামাজিক বৈষম্য ও প্রশাসনিক স্থিতিশীলতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখত:

- 👑 নবাব, জমিদার ও উচ্চ প্রশাসক
- 🕌 উলামা ও সুফি (আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব)
- 💼 মধ্যবিত্ত (ব্যবসায়ী, কারিগর ও সৈনিক)
- 🌾 কৃষক সমাজ (জনসংখ্যার প্রধান অংশ)
- ⬇️ দাস ও নিম্ন শ্রমজীবী শ্রেণি

🤝 হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের সহাবস্থান

- **প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক মেলবন্ধন:** মুসলিম নবাবরা শাসন করলেও হিন্দু জমিদার, ব্যবসায়ী ও কারিগররা সমাজে ব্যাপক প্রভাব বজায় রাখতেন।
- **উৎপাদন ক্ষেত্র:** কৃষিজীবনে উভয় সম্প্রদায়ের কৃষকরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসাথে কাজ করতেন।
- **সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন:** সুফি ও ভক্তি আন্দোলনের প্রভাবে সমাজে পারস্পরিক সহিষ্ণুতা, মানবিক সহমর্যাদা ও স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

গ্রামীণ সমাজ, নগরায়ণ এবং নারীসমাজের অবস্থান

গ্রামীণ জীবন

অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করত। ধান, আখ, তিল ও গম ছিল প্রধান ফসল। অতিরিক্ত করের বোঝা ও জমিদারি শোষণ সত্ত্বেও যৌথ পরিবার, স্থানীয় মোলভি ও উৎসবমুখর জীবন গ্রামীণ ঐক্য টিকিয়ে রাখত।

নগরায়ণ ও বাণিজ্য

গৌড় ও মুর্শিদাবাদের মতো নগর কেন্দ্রগুলো গড়ে ওঠে। এখানে হস্তশিল্প, ধাতুশিল্প ও বস্ত্রশিল্পের বিকাশ ঘটে। বিদেশি বণিকদের আগমন বন্দরগুলোকে সমৃদ্ধ করে এবং ফারসি সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে।

নারীসমাজ

অভিজাত হিন্দু ও মুসলিম নারীরা গৃহকেন্দ্রিক জীবনযাপন করলেও সমাজে মর্যাদা ভোগ করতেন। সাধারণ নারীরা কৃষিকাজ, গৃহস্থালি ও হস্তশিল্পে অতি সক্রিয় অর্থনৈতিক অবদান রাখতেন।

শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্পচর্চা

📚 দ্বিমুখী শিক্ষাব্যবস্থা

শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল প্রধানত প্রথাগত ও ধর্মভিত্তিক। মুসলিমদের জন্য **মাদ্রাসা** (কুরআন, হাদিস, ফিকাহ এবং প্রশাসনিক মাধ্যম ফারসি) এবং হিন্দুদের জন্য **টোল বা পাঠশালা** (সংস্কৃত, ব্যাকরণ ও দর্শন) প্রচলিত ছিল।

✍️ ভাষা ও সাহিত্য বিকাশ

প্রশাসনিক কাজে ফারসি এবং ধর্মীয় ও আইনি ক্ষেত্রে আরবি ব্যবহৃত হলেও, সাধারণ মানুষের মাঝে লোককাব্য এবং সুফি সাধকদের সহজ সরল বাংলায় রচিত সাহিত্য ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়।

🎨 স্থাপত্য ও হস্তশিল্প

মুর্শিদাবাদ ও গৌড় শহরে মসজিদ ও প্রাসাদ নির্মাণে ইট, টেরাকোটা ও জ্যামিতিক নকশার মেলবন্ধন ঘটে। হস্তশিল্প ও ধাতুশিল্প নগর অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করত।

চিত্র: মুঘল শাসনামলে বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতিফলন

সুফিবাদের উৎপত্তি ও ঐতিহাসিক প্রসার

ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে উৎপত্তি: সুফিবাদের বীজ ইসলামের সূচনাকাল থেকেই প্রোথিত। মহানবি (সা.) হেরা গুহার নির্জন ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। তাঁর কতিপয় ঘনিষ্ঠ সাহাবিও এই মরমি ভাবধারা ও কৃচ্ছ্রতাবাদী জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন, যারা মূলত 'আহলুস সাফফা' নামে সুপরিচিত।

ঐতিহাসিক সংকটে মরমি জাগরণ: প্রথম খলিফাগণ অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যেও মরমি চিন্তা লালন করতেন। পরবর্তীতে হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর মুসলিম সমাজে যে রাজনৈতিক বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তার প্রতিক্রিয়াতেই অসংখ্য মুসলমান আত্মশুদ্ধি ও মরমি প্রসারে তীব্রভাবে ঝুঁকে পড়েন।

> *"সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; বরং এটি অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। যে মুহূর্ত থেকে মরমি আয়াতসমূহ নবি করিম (সা.) এর ওপর নাজিল হয়েছে, সে মুহূর্ত থেকেই এর উৎপত্তি হয়েছে। Sufism is as old as Islam."*
> — *ড. সৈয়দ নাদভি, **'Muslim Thought and its Source'***

সুফি দর্শনের মূলস্তম্ভ ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ

ঐশী সত্তার মূর্ত প্রকাশ

সমগ্র সৃষ্টিজগতের সব কিছু কেবল পরম স্রষ্টার মূর্ত প্রকাশ। মানুষের শিরার ভেতরেও আল্লাহর হুকুম ও ইচ্ছা প্রবাহমান। তিনি স্বাধীনভাবে সৃষ্টি ও রূপান্তর করতে পারেন। সুফিরা বিশ্বাস করেন আল্লাহই একমাত্র চিরন্তন সত্য সত্তা।

সম্যক পরিজ্ঞাত ও আল্লাহর প্রেম

কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী'আল্লাহই প্রথম, শেষ, প্রকাশমান ও গোপন সকল বিষয়ে অবগত। সুফিবাদ ভয়ের নয়, বরং নিস্বার্থ ও খাঁটি প্রেমের সর্বোচ্চ সাধনা। প্রেমের মাধ্যমে স্রষ্টায় নিজেকে সমর্পণ করে আধ্যাত্মিক মারিফত বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করাই সুফিদের একমাত্র লক্ষ্য।

ফানা ও ওয়াহদাতুল উজুদ

বায়েজিদ বোস্তামি সর্বপ্রথম আত্মবিলোপ বা 'ফানা'র তত্ত্ব প্রবর্তন করেন। পরবর্তীতে মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবির 'ঐশী বিকিরণ' বা 'ওয়াহদাতুল উজুদ' (অস্তিত্বের একত্ববাদ) দর্শন জালালউদ্দিন রুমি, ইরাকি, শাবিস্তারি, কাশানি ও জামির মতো বিখ্যাত সুফিদের প্রভাবিত করে।

সুফিবাদের বৈজ্ঞানিক পূর্ণতা ও তরিকা প্রতিষ্ঠা

পর্যায় ও ব্যক্তিত্ব	প্রধান দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি	ঐতিহাসিক প্রভাব ও সংস্কার অবদান
মারুফ কারমি, জুননুন মিসরি ও বায়েজিদ	সহজ-সরল সাধনা ও ভাবোচ্ছ্বাসের মাধ্যমে জ্ঞানলাভ	সুফিবাদের দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁরা গভীর মরমি ভাব ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির জাগরণ ঘটান এবং একে বিস্তৃত রূপ দেন।
ইমাম আল গাজালি	জাহেরি (বাহ্যিক) ও বাতেনি (অভ্যন্তরীণ) সমন্বয়	সুফিবাদকে সুন্নি ধর্মতত্ত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং একে একটি যৌক্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান হিসেবে উন্নীত করেন।
জালালউদ্দিন রুমি	প্রেমময় মরমি দর্শন ও আধ্যাত্মিক কাব্যগাথা	তিনি পারস্যের কালজয়ী কাব্য ও সুফি দর্শনের মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যাপী সুফিবাদের সুবর্ণ যুগের গৌরবোজ্জ্বল চূড়া স্পর্শ করেন।
খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি ও আহমদ সিরহিন্দি	চিশতিয়া তরিকা এবং সুন্নাহর ভিত্তিতে সংস্কার	ভারত বর্ষের সাধারণ মানুষের মাঝে ইসলাম প্রচার করেন; পরবর্তীতে মুজাদ্দিদ আলফ সানি সুফিবাদের অপসংস্কৃতি দূর করে সুন্নাহর আলোকে আধ্যাত্মিক সংস্কার করেন।
মুহম্মদ ইবন আলি আসসানুসি	১৮৩৭ খ্রি. নতুন তরিকা ও আধ্যাত্মিক আন্দোলন	উত্তর আফ্রিকায় ইসলামি জাগরণ ও নতুন প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের সূচনা ঘটান, যা সুফিবাদের বৈশ্বিক প্রসারে ভূমিকা রাখে।

সুফিবাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

সুফিবাদের উৎস ও উৎপত্তি

সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; বরং এটি অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। যে মুহূর্ত থেকে মরমি আয়াতসমূহ নবি করিম (সা.) এর ওপর নাজিল হয়েছে, সে মুহূর্ত থেকেই এর উৎপত্তি হয়েছে।

"Sufism is old as Islam."
— ড. সৈয়দ নাদভি (Muslim Thought and its Source)

প্রাথমিক মরমি ভাবধারা ও আহলুস সাফফা

মহানবির নিজেরও মরমি ভাবধারার দিকে প্রবণতা ছিল এবং তিনি হেরা গুহার নির্জন স্থানে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। কতিপয় ঘনিষ্ঠ সাহাবাও তাকে অনুসরণ করতেন, যারা জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য পরিহার করে মসজিদে নববিতে আল্লাহর গভীর ধ্যানে নিয়োজিত রাখতেন। তারা **আহলুস সাফফা** নামে সুপরিচিত ছিলেন।

ঐশী সত্তা ও কুরআনের তাত্ত্বিক দর্শন

সত্তার মূর্ত প্রকাশ

সমগ্র জগৎ এবং এ জগতে যা কিছু আছে তা কেবল ঐশী সত্তার মূর্ত প্রকাশ। মানুষের শিরার ভিতরেও আল্লাহর হুকুম প্রবাহমান। আল্লাহ তার সৃষ্টিতে যেমন খুশি তেমনিভাবে সৃষ্টি এবং ধ্বংস করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, সকল বস্তু আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট। সুফিসাধকের মূল লক্ষ্য হলো নিজেকে স্রষ্টার মধ্যে বিলীন করে দেওয়া। সুফিরা বিশ্বাস করেন যে, **আল্লাহ হচ্ছেন একমাত্র প্রকৃত সত্তা** আর অন্য সবকিছু তারই মূর্ত প্রকাশ।

সম্যক পরিজ্ঞাত সত্তা

সুফিরা কুরআনের আয়াতের সমর্থনে বলেন যে, আল্লাহ প্রথম তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।
নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবাই তাঁর কাছে প্রার্থী। তিনি সর্বদাই কোনো না কোনো কাজে রত আছেন। আল্লাহ পরম শ্রবণকারী ও পরিজ্ঞাত। তিনি যা ইচ্ছা করেন, নিখিল বিশ্বে কেবল তা-ই বাস্তবায়িত হয়।

❤ মরমির প্রসার ও প্রেমময় সাধনা

↑ মরমির প্রসার ও ঐতিহাসিক বিপর্যয়

প্রাথমিক যুগে খলিফাগণ শত ব্যস্ততার মধ্যেও নিজেদেরকে মরমি ভাবধারায় নিয়োজিত রাখতেন। শুরুতে এ ধরনের মরমি ভাবধারা অল্পসংখ্যক মুসলমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।
হযরত উসমানের রাজত্বকালের পরবর্তীতে মুসলিম জগতে যে বিরাট বিপর্যয় ঘটে, তার ফলে মরমি ভাবধারার ব্যাপক প্রসার ঘটে। এই বিপর্যয়ের মুখে মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে মরমি ভাবধারা তীব্রভাবে জেগে উঠে এবং পরিণামে এই মতবাদ অগ্রগতির পথে ধাবিত হয়।

∞ প্রেমময় সাধনা ও ভক্তিযোগ

সুফিবাদের মূল দর্শন হলো এটি ভয়ের ওপর নয়, বরং **প্রেমের ওপর প্রতিষ্ঠিত**। প্রেম ও ভালোবাসাই হচ্ছে সুফিবাদের মূল সুর।

- ভক্তি ও প্রেম সাধনার মাধ্যমে সুফিসাধক মরমি অভিজ্ঞতার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছান।
- সুফিদের কাছে প্রেমের একমাত্র এবং প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হলো এটি হবে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ, খাঁটি ও নিস্বার্থ।

আধ্যাত্মিক পরিক্রমা ও তরিকা প্রতিষ্ঠা

আল্লাহর তত্ত্বজ্ঞান লাভ

সুফিদের মতে, আধ্যাত্মিক সিদ্ধি লাভের অনুভূতিই হলো আল্লাহর তত্ত্বজ্ঞান লাভের একমাত্র পন্থা। তাওহিদ হলো আল্লাহর সাথে আত্মার চূড়ান্ত মিলন যা ক্রমান্বয়ে সর্বখোদাবাদের রূপ ধারণ করে। জুননুন আল মিসরির সমসাময়িক সুফি বায়েজিদ বোস্তামি আত্মবিলোপ ও আত্মবিনাশ সম্পর্কিত মতবাদের মাধ্যমে ইসলামি মরমিবাদের প্রবর্তন করেন।

ঐশী বিকিরণ (ওয়াহদাতুল উজুদ)

ইবনুল আরাবির ঐশী বিকিরণ বা প্রবহণ মত প্রধানত সর্বেশ্বরবাদী এবং **ওয়াহদাতুল উজুদ** মত নামে সুপরিচিত। তিনি পরবর্তীকালের সর্বখোদাবাদী সুফিদের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেন। জালালউদ্দিন রুমি তাঁর মতের দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত হন। পরবর্তীতে ইরাকি, শাবিস্তায়ী, কাশানি, আথজিথি এবং জামির মতো সুফিগণও এই ধারায় প্রভাবিত হন।

তরিকা প্রতিষ্ঠা

পাক-ভারত ও বাংলাদেশ তথা এই উপমহাদেশে খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি জনসাধারণের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেন। উপমহাদেশে তাঁর বহু স্বনামধন্য শিষ্য রয়েছেন। এ ছাড়া বিশিষ্ট সুফি মুজাদ্দিদ আলফ সানি নামে পরিচিত শায়খ আহমদ সিরহিন্দি অন্যতম। পরবর্তীতে আলজেরিয়াতে শায়খ মুহম্মদ ইবন আলি আসসানুসি ১৮৩৭ খ্রি. একটি নতুন তরিকা প্রতিষ্ঠা করেন।

জ্ঞানতাত্ত্বিক সমন্বয় ও সুন্নি ধর্মতত্ত্ব

জাহেরি ও বাতেনি সমন্বয়

সুফিবাদের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় মারুফ কারমির দ্বারা। তিনি ছিলেন একজন সহজসরল ও খাঁটি সাধক। তাঁর মতে, ভাবোচ্ছ্বাসই হচ্ছে আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়। মারুফ কারমি ছাড়াও বায়েজিদ বোস্তামি ও জুননুন মিসরি এ পর্যায়ের অন্যতম সাধক ছিলেন।

ইমাম আল গাজ্জালি এই পর্যায়ে এসে ইসলামের বাহ্যিক (জাহেরি) এবং অভ্যন্তরীণ (বাতেনি) দিকের অপূর্ব সমন্বয় সাধন করে সুফিবাদকে পূর্ণতা দান করেন।

সুন্নি ধর্মতত্ত্বের অংশ সুফিবাদ

মুসলিম স্কলাস্টিকবাদে ইমাম আল গাজালি সুন্নি ধর্মতত্ত্বে একটি রূপান্তরিত গোঁড়া সুফিবাদ প্রবর্তন করেন। তখন থেকেই সুফিবাদ সুন্নি ধর্মতত্ত্বের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পরিগণিত হয় এবং তিনি এটিকে একটি বৈজ্ঞানিক রূপে উন্নীত করেন। পারস্যের বিখ্যাত সুফি কবি জালালউদ্দিন রুমি সুফিবাদের এই সুবর্ণ যুগের সমাপ্তি টানেন।

সুফিবাদের উৎপত্তি সম্পর্কিত মতবাদ

ঐতিহাসিক তুলনামূলক মতবাদসমূহ

- **খ্রিস্টধর্মের প্রভাব:** খ্রিস্টধর্মের বৈরাগ্যবাদ ও প্রচারকদের সংস্পর্শে এসে প্রাথমিক মুসলিম সাধকদের সরল জীবনযাপন ও পশমি বস্ত্র (সুফ) পরিধানের ভাবধারা গড়ে ওঠে বলে অনেকে মনে করেন।
- **বৌদ্ধধর্মের প্রভাব:** গোল্ডজিহার ও অন্যান্য গবেষকের মতে, সুফিদের জপমালা ব্যবহার এবং সাধনার উচ্চতর ধাপে ফানা বা আত্মবিলোপের ধারণাটি বৌদ্ধধর্মের নির্বাণ ও মোকাম ভাবধারার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

পারসিক সংস্কৃতির প্রভাব

এই মতবাদে বিশ্বাসীদের মতে, মুসলমানদের পারস্য বিজয় ছিল সংস্কৃতির সংমিশ্রণ। বিজিত উন্নত পারসিক জাতির মধ্যে এক ধরনের হতাশা ও নৈরাশ্য থেকে কৃচ্ছ্রবাদের জন্ম হয়, যা পরবর্তী সময়ে সুফি আধ্যাত্মিকতার প্রসারে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল।

বেদান্ত দর্শনের প্রভাব

গবেষক এম. হর্টেনের (M. Horten) মতে, সুফিবাদের বিকাশে বেদান্ত দর্শনের গভীর প্রভাব রয়েছে। বেদান্তের '**মায়াবাদ**'-এর সাথে সুফিদের জাগতিক অসারতা তত্ত্বের সাদৃশ্য পাওয়া যায়।
এছাড়াও, ভারতীয় উপমহাদেশের ঋষি ও সন্ন্যাসীদের কৃচ্ছ্রসাধন, কঠোর সংযম এবং নিরাসক্ত জীবনধারা সুফিদের জীবন দর্শনে গভীর রেখাপাত করে।

নব্য-প্লেটোবাদ ও পারসিক প্রভাব

অনেকে সুফি দর্শনে গ্রিক নব্য-প্লেটোবাদী (Neo-Platonism) অনুধ্যানমূলক জ্ঞানের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। তবে সুফিবাদের সকল আলোচনা পুরোপুরি গ্রিক দর্শনজাত নয়।

অন্য এক মতানুসারে, পারস্য বিজয়ের পর পারসিকদের নিজস্ব উন্নত সংস্কৃতির অবদমন থেকে উদ্ভূত এক আধ্যাত্মিক কৃচ্ছ্রবাদ ও নৈরাশ্যবোধ সুফিবাদের প্রসারে সহায়তা করে।

সুফিবাদের উৎপত্তি সম্পর্কিত মতবাদ

পরমসত্তা ও বাস্তব জগৎ

সুফি দর্শনের মূল ভিত্তি হলো- আল্লাহ একমাত্র পরমসত্তা। এই দৃশ্যমান বিশ্বজগৎ হলো তাঁর পরম সৌন্দর্যের এক মূর্ত বহিঃপ্রকাশ। জগতের যাবতীয় বস্তু তাঁর থেকে নিঃসৃত হয়েছে।

এটি বেদান্তের মায়াবাদ বা বৌদ্ধদের শূন্যতাবাদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জীবনমুখী আধ্যাত্মিকতা।

সুফি জ্ঞানতত্ত্বের উৎস ও কাশফ

সাধারণ মানুষ ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে বাহ্যিক জ্ঞান লাভ করে। কিন্তু পরমসত্তার গভীর ঐশী জ্ঞান বা কাশফ (Kashf) কেবল হৃদয়ের প্রদীপ্ত অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মাধ্যমেই সম্ভব।

সুফিদের জ্ঞানতত্ত্ব বুদ্ধিবাদীদের চেয়ে স্বতন্ত্র; কারণ পরমসত্তা কোনো দৈহিক বা বস্তুগত সত্তা নয়।

ঐশী শক্তির মূর্ত প্রকাশ

সমগ্র জগৎই ঐশী শক্তির প্রতিচ্ছবি। মানুষের যখন আত্মিক চেতনার উন্মেষ ঘটে এবং অহং-এর বিনাশ ঘটে, তখন সে নিখিল বিশ্বে কোনো অমঙ্গল দেখতে পায় না। সকল দুঃখ ও অনিষ্ট চেতনাগত ক্ষুদ্রতার কারণেই অনুভূত হয়।

রুহ ও নফছের দ্বন্দ্ব

মানুষের শরীরে দুটি সক্রিয় শক্তি বিরাজমান। প্রথমটি হলো রুহ বা আত্মা যার আকর্ষণ সবসময় স্রষ্টার আলোর দিকে। দ্বিতীয়টি হলো নফছ বা রিপু যা মানুষকে জাগতিক লোভ-লালসা ও অন্ধকারের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

আল্লাহ ও মানুষের প্রেম

সুফিবাদে আল্লাহ ও মানুষের মধ্যকার দূরত্ব কেবল ভালোবাসার মাধ্যমেই বিলীন হয়। আল্লাহ কোনো দূরবর্তী নৈর্ব্যক্তিক শক্তি নন, বরং সুগভীর প্রেমের স্পন্দনে মানুষ অন্তরের অন্তস্থলে মাশুকের (পরম প্রিয়তম) নৈকট্য অনুভব করে।

সুফিবাদের মূলতত্ত্ব ও লক্ষ্য

পরমসত্তার সান্নিধ্য লাভ

সুফিবাদের প্রধান লক্ষ্য হলো পরম করুণাময় আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ। পরমসত্তার সাথে মিলনে পরম পাওয়ার যে চরম পরিতৃপ্তি, তাই সুফি সাধককে ক্ষণস্থায়ী পার্থিব প্রলোভন ও আপাত মধুর ইন্দ্রিয় শক্তি থেকে মুক্ত করে।

এটি সাধককে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনায় সার্থক করে তোলে। সুফিবাদের মূলতত্ত্ব হলো আল্লাহর তওহিদ তথা একত্ববাদ পরিপূর্ণরূপে রক্ষা করা, যা সাধকের আত্মিক যাত্রাকে বেগবান করে তোলে।

সুফি সাধনার স্তম্ভসমূহ

আত্মসমর্পণ

সুফি সাধকগণ আল্লাহর ইচ্ছার নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেন। তারা পার্থিব অহংকার ও নিজের ইচ্ছা পরিহার করে খোদার ইচ্ছার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যবিধান করে দিন যাপন করেন।

তওবা

পাপ পরিবর্জন ও পাপ পথে আর অগ্রসর না হওয়ার প্রতিজ্ঞাই হলো তওবা। এটি হলো মোহনিদ্রা থেকে আত্মার জাগরণ, যা সাধক ও আল্লাহর মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টিকারী সকল পাপের চিন্তা দূর করে।

আল্লাহ প্রেম

সুফিদের আত্মা সর্বদা আল্লাহর চিন্তায় মগ্ন থাকে, তাই সুফিবাদ 'প্রেমদর্শন' নামেও সুপরিচিত। সুফিদের এই 'ইশকের' বা ঐশী প্রেমের ধারণা এতটাই সর্বজনীন যে পার্থিব কোনো মোহ তাদের এ থেকে ফেরাতে পারে না।

ধৈর্য (সবর)

দুঃখ, বিপদ ও আল্লাহর পরীক্ষার সময় মনের ভারসাম্য রক্ষা করা। ইমাম গাজালির মতে, "ধৈর্য হলো শয়তানের প্ররোচনা ও আত্মার নিম্নতর প্রবৃত্তি সম্পর্কে হুশিয়ারিতে পূর্ণ বিশ্বাস।"

ত্যাগ

পার্থিব সুখ ও বিলাসিতা ত্যাগ করা। বাহ্যিক ত্যাগে দৈহিক প্রয়োজন হ্রাস করা এবং অভ্যন্তরীণ ত্যাগে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর মোহ থেকে আত্মাকে মুক্ত রাখা হয়। স্বল্প আহার ও নিদ্রাতেই এর পূর্ণতা নিহিত।

ফানা ও বাকা

সুফি সাধনার সর্বোচ্চ স্তর। ফানা হলো আত্মবিনাশ; চেতনাকে ঐশী চেতনায় সমাহিত করা। বাকা হলো ঐশীসত্তায় স্থায়িত্ব লাভ করা, যেখানে সাধকের সমুদয় ইচ্ছা খোদার ইচ্ছায় লয়প্রাপ্ত হয়।

কাশফ

অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মাধ্যমে আল্লাহর বাস্তব জ্ঞানলাভ। প্রজ্ঞা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি যা দিতে পারে না, ফানাফিল্লাহ অবস্থায় আল্লাহর অসীমতার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে সাধক সেই নিবিড় মুহূর্তে তা লাভ করেন।

জিকির

আল্লাহর নাম বা কুরআনের কোনো আয়াত বারবার তেলাওয়াত করা। কুরআন নির্দেশিত এই জিকিরের মূল উদ্দেশ্য হলো নিজের ক্ষুদ্র সত্তাকে বিস্মৃত হয়ে পরম সত্তা তথা আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া।

শোকর (কৃতজ্ঞতা)

আল্লাহর প্রতি সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকা। ইমাম গাজালির মতে, ইমানই কৃতজ্ঞতার উৎস। সমুদয় কল্যাণ আল্লাহর করুণা থেকে নিঃসৃত, এই বিশ্বাসই সুফিকে সমগ্র জীবনজুড়ে আল্লাহর শোকর করতে অনুপ্রাণিত করে।

পবিত্রতা

হৃদয়ের নির্মলতা ও সরলতা রক্ষা করা; কারণ পবিত্র মনেই আল্লাহর নুর প্রতিবিম্বিত হয়। সন্দেহজনক কাজ ও বিবেকের বিরোধী কর্ম বর্জন করে ঐশী আনুগত্য ও ত্যাগের মাধ্যমে এই পবিত্রতা অর্জিত হয়।

সংগীত (সামা)

সংগীতের সুর অন্তরের আধ্যাত্মিক অনুভূতি জাগিয়ে তোলে এবং মনকে আল্লাহর ধ্যানে নিবিষ্ট করতে সাহায্য করে। চিশতিয়া তরিকার সুফিগণ তাম্বুরা বাজিয়ে 'সামা' গেয়ে আধ্যাত্মিক ভাব জাগিয়ে তোলেন।

তাওয়াক্কুল

সব অবস্থায় একমাত্র আল্লাহর ওপর নির্ভর করার নাম তাওয়াক্কুল। সর্বশক্তিমান আল্লাহ ব্যতীত অন্য শক্তির ওপর নির্ভরতা বর্জন করে কেবল আল্লাহর ওপর সম্পূর্ণ আস্থা ও ভরসা প্রতিষ্ঠা করাই সুফির মূল লক্ষ্য।

বাংলায় সুফিবাদের আগমন ও বিস্তার

সূচনা ও প্রসার

খাজা মঈনউদ্দিন চিশতির মাধ্যমে ভারত উপমহাদেশে চিশতিয়া তরিকার যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে বাংলায় সুফিবাদ চরম প্রসার লাভ করে এবং গ্রামীণ অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। বাংলায় চিশতিয়া ও সোহরাওয়ার্দীয়া তরিকার প্রাধান্য ছিল লক্ষণীয়। দেশের আনাচে-কানাচে খানকা ও দরগাহ গড়ে ওঠে।

হযরত মীর সৈয়দের ঐতিহাসিক পত্র (১৩৮০ খ্রি.)

হযরত মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শার্কীকে লিখেছিলেন:

> *"কি চমৎকার দেশ এই বাংলা- যেখানে অসংখ্য সাধু, দরবেশ ও তাপসগণ বিভিন্ন দিক থেকে আগমন করেন এবং বাংলাকেই তাদের দেশ ও বসবাসের স্থান হিসেবে বেছে নেন।"*

বাবা আদম শহীদ ও সুলতান রুমি

হযরত বাবা আদম শহীদ

মুন্সীগঞ্জের বিক্রমপুরে হিন্দু রাজা বললাল সেনের অত্যাচারের প্রতিকারার্থে তিনি মক্কা থেকে আগমন করেন। আবদুল্লাহপুরে আস্তানা গড়ে তোলেন। যুদ্ধে পরাজিত ও শাহাদাত বরণ করার পর বললাল সেন সপরিবারে মৃত্যুবরণ করেন। সংস্কৃতে রচিত 'বললালচরিত' গ্রন্থে তাঁর শত্রুকে "বায়াদুম" এবং তাঁর বাহিনীকে "ম্লেচ্ছ" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

শাহ মুহম্মদ সুলতান রুমি

১০৫৩ খ্রিস্টাব্দে (৪৪৫ হিজরি) ময়মনসিংহের নেত্রকোণার মদনপুরে আগমন করেন। তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে স্থানীয় একজন কোচ রাজা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদনপুর গ্রামটি দান করেন।

মাহী সওয়ার ও মখদুম শাহদৌলাহ

শাহ সুলতান মাহী সওয়ার

বলখের এই রাজপুত্র বিলাসী জীবন ত্যাগ করে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি মৎস্যাকৃতির নৌকাযোগে বা মাছের পিঠে চড়ে বাংলায় আসেন বলে তাঁকে 'মাহী সওয়ার' (মৎস্যারোহণকারী) বলা হয়। বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে তিনি রাজা পরশুরাম ও বলরামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হয়ে ইসলাম প্রচার করেন।

মখদুম শাহদৌলাহ শহীদ

ইয়েমেন ত্যাগ করে পাবনা জেলার শাহজাদপুরে আগমন করেন। স্থানীয় রাজার সাথে এক যুদ্ধে তিনি ও তাঁর অনুচররা শহীদ হন। তাঁর বোন অত্যাচারী রাজার হাত থেকে বাঁচতে পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে আত্মোৎসর্গ করেন, যা 'সতী বিবির ঘাট' নামে পরিচিত। শাহজাদপুরে তাঁর অনুসারীদের ২১টি কবর রয়েছে।

বায়েজিদ বোস্তামি ও শেখ ফরিদ ও তাবরিজি ও সিলেটের শাহজালাল

হযরত বায়েজিদ বোস্তামি

চট্টগ্রামের নাসিরাবাদে বিখ্যাত এই সুফি সাধকের মাজার শরিফ বিদ্যমান। লোকমুখে প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী তিনি ৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই বাংলায় এসেছিলেন। তবে তিনি তাঁর জীবদ্দশায় সরাসরি বাংলায় এসেছিলেন কি না তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে দ্বিমত রয়েছে। তা সত্ত্বেও তাঁর মাজার অত্যন্ত পবিত্র স্থান হিসেবে সমাদৃত।

হযরত শেখ ফরিদ

বাংলার ঘরে ঘরে শেখ ফরিদের নাম অত্যন্ত ভক্তিভরে উচ্চারিত হয়। চট্টগ্রামের পাহাড়ের পাদদেশে "চাশম শেখ ফরিদ" নামক ঝরনাটি তাঁর স্মৃতি বহন করে। শেখ ফরিদউদ্দিন গঞ্জ-ই-শকর উত্তর বাংলা পরিভ্রমণ করেছিলেন এবং চট্টগ্রাম ও ফরিদপুরেও আগমন করতে পারেন বলে ঐতিহাসিক বিশ্বাস রয়েছে। ফরিদপুর জেলার নামকরণ তাঁর নামানুসারেই হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

শেখ জালালউদ্দিন তাবরিজি

অনেক গবেষক ও ঐতিহাসিক (যেমন ইবনে বতুতা) মনে করেন শাহজালাল তাবরিজি ও শেখ জালাল মূলত একই ব্যক্তি। ১২৪৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি পাণ্ডুয়ার দেওতলায় ইন্তেকাল করেন। উত্তর বঙ্গে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে তাঁর অসাধারণ আদর্শ চরিত্র, মানব কল্যাণ এবং ঈশ্বরভক্তি সমাজ গঠনে চিরস্থায়ী ছাপ ফেলে গেছে।

সিলেটের হযরত শাহজালাল

আধুনিক গবেষকদের মতে সিলেটের শাহজালাল এবং শেখ জালালউদ্দিন তাবরিজি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তিত্ব। সিলেটের শাহজালাল বাংলার পূর্বাঞ্চলে (বিশেষ করে সিলেট অঞ্চলে) ইসলামের মহান বাণী ছড়ানোর ক্ষেত্রে অনন্য ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর জীবন ও সিলেট বিজয় নিয়ে সুনির্দিষ্ট প্রামাণিক লিপি পাওয়া যায়।

সিলেটের হযরত শাহজালাল (র.)

সিলেট বিজয় ও দিল্লী যাত্রা

তিনি দিল্লীতে হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করলে আউলিয়া তাঁকে একজোড়া কবুতর উপহার দেন। সিলেটের অত্যাচারী রাজা গৌরগোবিন্দের বিরুদ্ধে তিনি সিকান্দর গাজীকে সাহায্য করেন। তাঁর ও ৩৬০ জন শিষ্যের উপস্থিতিতে সম্মিলিত মুসলিম বাহিনী সিলেট বিজয় সম্পন্ন করে।

সংযম ও কৃচ্ছ্রসাধনার জীবন

ইবনে বতুতার বিবরণ অনুযায়ী তিনি দীর্ঘ ও ক্ষীণকায় ছিলেন। তিনি একাধারে ৪০ বছর রোজা রাখেন এবং কেবল একটি গাভীর দুধ পান করতেন। সারারাত উপাসনায় মগ্ন থাকতেন। ১৩৪৭ খ্রিস্টাব্দে প্রায় ১৫০ বছর বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

শেখ শরফউদ্দিন আবু তাওয়ামা

সোনারগাঁয়ে আগমন ও রাজনৈতিক পটভূমি

বুখারায় জন্ম নেওয়া শেখ শরফউদ্দিন তাওয়ামা ধর্মতত্ত্ব, হাদিস ও ফিকাহ শাস্ত্রে অসামান্য পণ্ডিত ছিলেন। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের দরবারে তাঁর অসামান্য প্রভাবের কারণে সুলতান নিজ ক্ষমতা হারানোর আশঙ্কায় তাঁকে সুকৌশলে সোনারগাঁয়ে পাঠিয়ে দেন। ১২৭৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি সোনারগাঁয়ে আসেন।

শিক্ষা ও সুফি সাধনার কেন্দ্র

তিনি সোনারগাঁয়ে পরিবার নিয়ে স্থায়ী বসতি গড়ে তোলেন। সেখানে একটি সুবিশাল মাদ্রাসা ও খানকা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর অধীনে জ্ঞানার্জনের জন্য দেশ-বিদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ শিক্ষার্থী ও সুফি সাধকদের আগমন ঘটে, যার ফলে পূর্ববঙ্গ একটি প্রধান জ্ঞান ও সুফি চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়।

ইলিয়াস শাহী আমলের বিখ্যাত সুফিগণ

শেখ রেজা বিরাবানী

সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের আমলে বাংলা পরিভ্রমণ করেন। তাঁর পবিত্র আগমনে সমকালীন বাংলার রাজধানী ও আপামর জনসাধারণ ধন্য হয়েছিল বলে লোকমুখে প্রচলিত আছে।

মখদুম জাহানীয়ান

তিনি এক বিশ্বভ্রমণকারী উঁচুমাপের আউলিয়া ছিলেন। তাঁর সুগভীর জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক প্রতিভা বাংলার মুসলিম সমাজকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। বহু মানুষ তাঁর নিকট দীক্ষা নেন।

খান জাহান আলী

দিল্লি থেকে বিতাড়িত হয়ে বাংলার সুন্দরবন অঞ্চলে এসে বন পরিষ্কার করে স্বাধীন বসতি ও শাসনকেন্দ্র গড়ে তোলেন। মানবসেবায় তাঁর অবদান আজও অবিস্মরণীয়।

হযরত খান জাহান আলী ও স্থাপত্যকীর্তি

খলিফাতাবাদ অঞ্চলের স্বাধীন শাসক

হযরত খান জাহান আলী মূলত সুন্দরবন অঞ্চলে জঙ্গল পরিষ্কার করে জনবসতি গড়ে তোলেন। তাঁর অমায়িক আচরণ ও জনকল্যাণমূলক কাজে মুগ্ধ হয়ে হাজার হাজার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি গৌড় বা দিল্লির অধীনতা এড়িয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন শাসকের মতো খলিফাতাবাদ পরিচালনা করতেন।

ঐতিহাসিক স্থাপত্য ও দিঘি

প্রবাদ আছে যে, তিনি এই অঞ্চলে ৩০০টি মসজিদ ও প্রচুর দিঘি খনন করেছিলেন। তাঁর কীর্তিগুলোর মধ্যে বাগেরহাটের ঐতিহ্যবাহী এবং বিশ্বখ্যাত **ষাটগম্বুজ মসজিদ** অন্যতম প্রধান ঐতিহাসিক নিদর্শন।

সাংস্কৃতিক সমন্বয়, ভক্তিমূলক সংগীত ও লোককাহিনি

স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে মিশ্রণ

সুফিরা বাংলার স্থানীয় সংস্কৃতিকে বর্জন না করে সমন্বয় ঘটান। পির-মুরিদ ঐতিহ্যকে গুরু-শিষ্য সম্পর্কের আদলে উপস্থাপন করায় সাধারণ মানুষ ইসলামকে বিদেশী ধর্ম হিসেবে না দেখে নিজস্ব ধর্ম বলে সহজে গ্রহণ করে।

ভক্তিমূলক গান ও কবিতা

গজল ও দোহার মাধ্যমে সুফিরা প্রেমের বাণী প্রচার করেন। স্থানীয় বৈষ্ণব ভাবাদর্শের সাথে সুফি গজলের চমৎকার মিশ্রণে আধ্যাত্মিক সুফি গান ও সাহিত্যের বিকাশ ঘটে, যা সাধারণ মানুষকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে।

লোককথা ও কিংবদন্তি

সুফিসাধকদের অলৌকিক কাহিনি ও গ্রামীণ লোকগাথাগুলো ইসলামি উপাদানের সাহায্যে সমৃদ্ধ করা হয়। এটি গ্রামীণ অশিক্ষিত সমাজে কৌতূহল ও আধ্যাত্মিক আকর্ষণ সৃষ্টি করে ইসলামি আদর্শ মজবুত করে।

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো: খানকা, মাজার, মানবসেবা ও শিক্ষা

খানকা ও মাজার স্থাপন

খানকা ও মাজারগুলো ছিল সুফিদের মূল প্রচারকেন্দ্র। এখানে দরিদ্রদের জন্য উন্মুক্ত লংগরখানায় বিনা মূল্যে নিয়মিত খাদ্য বিতরণ করা হতো। এই মানবসেবা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল এবং অমুসলিমদের মনে ইতিবাচক ধারণা তৈরি করে।

শিক্ষার প্রসার ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ

খানকাগুলো কেবল আধ্যাত্মিক সাধনাকেন্দ্র নয়, বরং বিনামূল্যে ধর্মীয় ও সাধারণ জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় বা মাদরাসা হিসেবে কাজ করতো। এখানে ইসলামি দর্শন, আরবি, ফারসি ছাড়াও মাতৃভাষায় শিক্ষা দিয়ে সংস্কার করা হতো।

সামাজিক সেবা ও সমতা প্রতিষ্ঠা

জাতিভেদ প্রথায় জর্জরিত তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় সুফিরা মানুষের সমতার বার্তা দেন। আর্তমানবতার সেবা, চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং নিপীড়িত ও উপেক্ষিত অন্ত্যজ সাধারণের অধিকারের পক্ষে কথা বলায় তারা ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পান।

রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন

সুফিরা রাজদরবারের সাথে সুসম্পর্ক ও শাসকদের আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনা দিয়ে রাজনৈতিক সমর্থন অর্জন করেন। এর ফলে বাংলায় মাজার, মসজিদ ও সুফি স্থাপনা নির্মাণে প্রশাসনিক ও আর্থিক সহায়তা পাওয়া সহজ হয়।

সহনশীলতার প্রচার ও তীর্থস্থান নির্মাণ

অহিংস ও সহনশীলতার নীতি

সুফিরা কখনই বলপ্রয়োগ বা কঠোর ধর্মীয় গোঁড়ামির নীতি অবলম্বন করেননি। তারা সকল ধর্মের মানুষকে সমানভাবে মূল্যায়ন করতেন, যার ফলে একটি শান্তিপূর্ণ ও ধর্মনিরপেক্ষ সহাবস্থানের আবহ তৈরি হয়েছিল।

মাজার ও তীর্থস্থান গড়ে তোলা

মৃত্যুর পর সুফিসাধকদের সমাধিগুলো পবিত্র মাজারে পরিণত হয়। ওরস ও বার্ষিক উৎসবের আয়োজন সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের মিলনমেলায় পরিণত হয়, যা ইসলামের সুমহান অহিংস চরিত্রকে বাংলার জনজীবনে চিরস্থায়ী রূপ দেয়।

নিম্নবর্ণের মুক্তি, বৌদ্ধ সমাজের রূপান্তর ও সামাজিক সাম্য

অন্ত্যজ ও বৌদ্ধ সমাজের ইসলাম গ্রহণ

১. **অন্ত্যজ শ্রেণির মুক্তি**: তৎকালীন হিন্দু সমাজের কঠিন জাতিভেদের কারণে নিগৃহীত অন্ত্যজ বা নিম্নবর্ণের মানুষরা সুফিদের স্পর্শে মানুষ হিসেবে বাঁচার দিশা পায় এবং ব্যাপক হারে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়।

২. **বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মান্তর**: সুদীর্ঘ চারশ বছরের পাল রাজত্বের পর সেন রাজত্বে বাংলায় নিগৃহীত ও অপসারিত বৌদ্ধ সম্প্রদায় সুফিদের কাছে সাম্য ও মানবিক আশ্রয় পেয়ে ব্যাপকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে।

ইসলামের সাম্যবাদ ও উদার মানসিকতা

৩. **সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা**: সুফিদের কাছে বাদশাহ ও ফকিরের কোনো ভেদাভেদ ছিল না। হিন্দু সমাজের চরম শ্রেণিবৈষম্যের বিপরীতে ইসলামের এই সাম্যবাদী চেতনা সুফিদের মাধ্যমে সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল।

৪. **গোঁড়ামিমুক্ত সামাজিক জীবন**: সুফিরা চরম উদারপন্থী হওয়ায় কোনো ধর্মীয় ধর্মান্ধতা সৃষ্টি করেননি। তারা সহজে সবার সাথে মিশতে পারতেন, যা বাংলার মানুষকে ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত করে।

জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড ও শাসকদের ওপর রাজনৈতিক প্রভাব

জনসেবামূলক কাজ ও জলাশয় খনন

সুফিরা খরাপ্রবণ এলাকায় দীঘি ও জলাশয় খনন করে জনসাধারণের খাবার জলের কষ্ট দূর করতেন। তাদের প্রতিষ্ঠিত মুক্ত লংগরখানাগুলো সমাজের অনাহারী ও হতাশ মানুষের প্রধান আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়।

নির্যাতিত মানুষের অধিকার রক্ষা ও শাসকদের শাসন

সুফিরা শাসকদের স্বেচ্ছাচারিতার হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করতে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নিতেন। শাসকরা সুফিদের সমীহ করতেন এবং প্রজাপীড়নের বিরুদ্ধে সুফি দরবেশদের উপদেশ মেনে নিতেন। প্রয়োজনে সুফিরা নির্যাতিতের পক্ষে প্রতিরোধ গড়েন।

ইসলামি প্রতিষ্ঠানের বিস্তার ও রাজনৈতিক শক্তি

সুফিদের চেষ্টায় অগণিত মসজিদ ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের প্রভাবে বাংলায় ইসলামের শেকড় গভীর ও মজবুত হওয়ার সাথে সাথে মুসলিম সুলতান ও রাজন্যবর্গের শাসনের গ্রহণযোগ্যতা বহুগুণ বেড়ে যায়।

মেগাস্থিনিস (Megasthenes)

ঐতিহাসিক দলিল 'Indika'

মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজদরবারে গ্রিক রাজদূত মেগাস্থিনিসের অভিজ্ঞতা প্রাচীন বাংলার এক অনন্য প্রামাণ্য উৎস।

- গঙ্গা অববাহিকার উর্বর ভূমি ও সুশৃঙ্খল কৃষিব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা।
- প্রধান কৃষিপণ্য হিসেবে ধান উৎপাদনে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা।
- বাঙালি সমাজের সততা, সরলতা ও প্রবাদপ্রতিম অতিথিপরায়ণতা।
- নৌ ও স্থল বাণিজ্যের চমৎকার সংযোগ ও বাজারের বিকাশ।

ফাহিয়েন (Fahien)

ধর্ম ও সমাজ-সংস্কৃতির সমন্বয়

চীনা বৌদ্ধভিক্ষু ও ভ্রমণকারী ফাহিয়েন (৩৩৭-৪২২ খ্রি.) বঙ্গ অঞ্চল ভ্রমণ করেন এবং প্রাচীন বাংলার আধ্যাত্মিক ও জাগতিক জীবন চিত্রায়িত করেন।

- ✓ **বৌদ্ধধর্মের প্রসার:** বাংলায় অসংখ্য বৌদ্ধমঠ, স্তূপ ও ধর্মীয় কেন্দ্রের উপস্থিতি ছিল।
- ✓ **শান্তিপ্রিয় সমাজ:** বাংলার মানুষ শান্তিপ্রিয়, অতিথিপরায়ণ ও নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন ছিল।
- ✓ **কৃষিনির্ভর অর্থনীতি:** ধান, তিল, আখসহ বিভিন্ন ফসল উৎপাদন ছিল অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি।
- ✓ **বাণিজ্য ও যোগাযোগ:** হাটবাজার, সড়ক ও নৌপথ অর্থনৈতিক ও সামাজিক যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ছিল।
- ✓ **শিক্ষা ও সংস্কৃতি:** বৌদ্ধমঠগুলো ধর্মীয় শিক্ষা, জ্ঞানচর্চা ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করত।

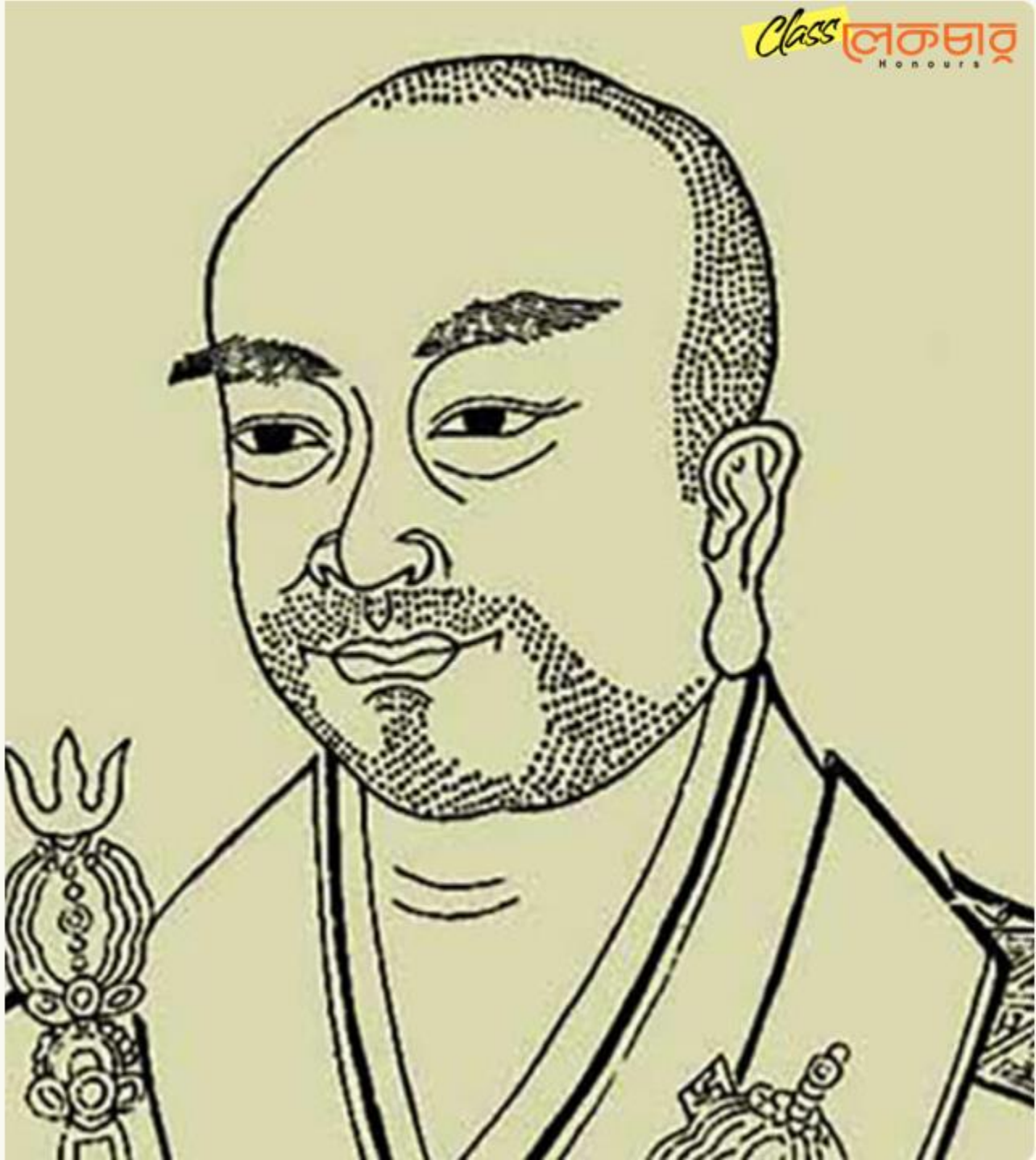

হিউয়েন সাং (Hiuen Tsang)

জ্ঞানচর্চা ও সামাজিক সম্প্রীতি

সপ্তম শতাব্দীতে আসা এই সুপ্রসিদ্ধ চীনা বৌদ্ধভিক্ষুর 'Da Tang Xiyu Ji' গ্রন্থটি তৎকালীন বাংলার সমৃদ্ধতম বর্ণনা প্রদান করে।

- বৌদ্ধ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ এবং ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সহাবস্থান।
- নালন্দা ও বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধিক খ্যাতি।
- উৎসবপ্রিয় বাঙালি জাতি; গান, নাচ ও নাট্যকলা সামাজিক জীবনের প্রধান অঙ্গ।
- কৃষির প্রাচুর্য এবং নদীভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে নগরায়ণের বিকাশ।

মার্কোপোলো (Marco Polo)

মধ্যযুগীয় বাংলার বিশ্ববাণিজ্য

ইতালীয় বিশ্বখ্যাত পরিব্রাজক মার্কোপোলোর (১২৫৪-১৩২৪ খ্রি.) বিবরণীতে বাংলার বিশ্ববাণিজ্যের স্বর্ণালী অধ্যায় প্রকাশ পেয়েছে।

- **উৎপাদিত পণ্যের প্রাচুর্য:** মসলিন, সূক্ষ্ম রেশম, লবণ ও উন্নত মশলার বিশ্বজোড়া কদর।
- **আন্তর্জাতিক নদী বন্দর:** বিশ্ব বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে বাংলার বন্দরগুলোতে বিদেশি বণিকদের আনাগোনা।
- **পারিবারিক শৃঙ্খলা:** বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং সামাজিক সংহতি।
- **সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি:** উৎসব, গান, নৃত্য ও নাট্যকলা মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল।

ইবনে বতুতা (Ibn Battuta)

প্রাচুর্যের স্বর্গরাজ্য বাংলা

মরোক্কান বিশ্বখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতার বিবরণীতে বাংলার সস্তা ও সুলভ জীবনযাত্রার অনন্য চিত্র বিধৃত হয়েছে।

- **সমৃদ্ধ কৃষি অর্থনীতি:** ধান-চাউলের প্রাচুর্য ও সুলভ মূল্য বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পরিচয় বহন করত।
- **আন্তর্জাতিক বাণিজ্য:** সোনারগাঁও থেকে চীন, জাভা ও মালদ্বীপের সঙ্গে সমুদ্রপথে বাণিজ্য পরিচালিত হতো।
- **সুফিবাদের প্রভাব:** সুফি দরবেশ ও পীরদের সমাজে বিশেষ মর্যাদা ছিল এবং ইসলাম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন।
- **সুশাসন ও রাজনীতি:** সুলতান ফখরুদ্দিন মুবারক শাহকে ন্যায়পরায়ণ, দক্ষ ও স্বাধীন শাসক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
- **ভৌগোলিক পরিচয়:** চট্টগ্রাম, সোনারগাঁও, কামরূপ, গঙ্গা ও মেঘনা নদীর উল্লেখ তৎকালীন বাংলার ভূগোলকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।
- **সামাজিক জীবন:** বাংলার সমাজে ধর্মীয় সম্প্রীতি, সুফি প্রভাব এবং শান্তিপূর্ণ জনজীবনের পরিচয় পাওয়া যায়।

মাহুয়ান (Ma Huan)

সুলতানি আমলের সমাজচিত্র

চীনা রাজকীয় দোভাষী মাহুয়ানের বিবরণ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর স্বাধীন সুলতানি আমলের বাংলার স্পষ্ট সমাজচিত্র পাওয়া যায়।

- **সমুদ্রপথে আগমন:** ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দে সুমাত্রা ও নিকোবর হয়ে তিনি চট্টগ্রামে পৌঁছান।
- **সমৃদ্ধ নগরজীবন:** সোনারগাঁও ও গৌড়ের প্রশস্ত রাজপথ, প্রাচীরবেষ্টিত নগর ও সারিবদ্ধ বাজারের বর্ণনা পাওয়া যায়।
- **উন্নত শিল্প ও সংস্কৃতি:** বস্ত্র, কাগজ, মাটির বাসন, অলংকার ও সংগীতচর্চা বাংলার সাংস্কৃতিক বিকাশের পরিচয় বহন করত।
- **বৈচিত্র্যময় খাদ্যাভ্যাস:** ধান ছিল প্রধান শস্য এবং বিভিন্ন দেশীয় পানীয় ও খাদ্যদ্রব্য প্রচলিত ছিল।
- **উন্নত কৃষি ব্যবস্থা:** বছরে দুইবার ধান উৎপাদন বাংলার কৃষি সমৃদ্ধির প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
- **মুদ্রা ও বাণিজ্য:** বড় লেনদেনে রৌপ্যমুদ্রা এবং খুচরা বাণিজ্যে কড়ির ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

ফেইসিন

রাজকীয় সংবর্ধনা (১৪১১-১৪১৫ খ্রি.)

চীন সম্রাটের রাজপ্রতিনিধি ফেইসিন সাইফুদ্দিন হামজা শাহের সময়ে সমুদ্রপথে চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছান। বন্দরে ১০০০-এর বেশি পদাতিক ও ঘোড়সওয়ার সেনা হাতি-ঘোড়া সাজিয়ে চীনা প্রতিনিধিদলকে মহা সমাদরে রাজকীয় সংবর্ধনা জানায়। সেখান থেকে ১৬টি চেকপোস্ট বা 'ছাড়-ঘাট' পেরিয়ে তাঁরা প্রাচীরঘেরা সোনারগাঁও শহরে পৌঁছান।

উর্বর ভূমি ও বিশ্বসেরা মসলিন

উর্বর পলিমাটির ভূমিতে বছরে দুবার সুস্বাদু ধান পাকত। নারী ও পুরুষ কৃষি মৌসুম শেষে অবসর সময়ে চরকা কেটে অত্যন্ত সূক্ষ্ম কার্পাস কাপড় বুনতেন। মসলিন, উন্নত শাল, রেশম এবং কম্বল ছিল বাংলার প্রধানতম বৈশ্বিক শিল্পদ্রব্য।

নারী সাজসজ্জা ও ফ্যাশন সচেতনতা

বাঙালি নারীরা সুতি খাটো কামিজ পরতেন এবং তার ওপর জড়িয়ে রাখতেন রেশমি বা কিংখাবের নকশাদার ওড়না। কানে পরতেন দামি পাথরখচিত চমৎকার দুল বা রিং, মাথার চুল পেছনে খোঁপা করে বাঁধতেন। এছাড়া সৌন্দর্যবর্ধনে হাতে সোনার বালা, পায়ে নুপুরের মতো মল এবং হাত ও পায়ের আঙুলে আংটি ব্যবহার করা হতো।

লুডোভিচ দ্য ভারথেমা

> থাকার জন্য এই শহরটিই (বাংলা) সমগ্র পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ। শস্য, সব রকমের মাংস, চিনি, আদা ও তুলা এত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় যা অভাবনীয়।

— লুডোভিচ দ্য ভারথেমা, ইতালীয় পর্যটক (১৫০৫ খ্রি.)

বোলোগ নগরের এই বাসিন্দা ১৫০৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় এসে আলাউদ্দিন হোসেন শাহের শাসনকাল প্রত্যক্ষ করেন। তিনি উল্লেখ করেন, হোসেন শাহ উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রদেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন এবং তাঁর অধীনে ২ লক্ষ পদাতিক ও অশ্বারোহী সেনা নিয়োজিত ছিল। প্রতি বছর প্রায় ৫০টি বড় জাহাজ তুলা ও রেশম বোঝাই হয়ে বাংলা থেকে তুরস্ক, সিরিয়া, পারস্য, আরব ও ইথিওপিয়ায় পাড়ি জমাত।

ডুয়ার্তে বারবোসার বর্ণনায় অভিজাত সমাজ

- **পর্তুগিজ নাবিকের আগমন (১৫১৪ খ্রি.):** বারবোসা গঙ্গা নদীর খাত ধরে বাংলায় প্রবেশ করেন। তিনি শক্তিশালী ও সমৃদ্ধশালী মুসলিম সুলতানদের রাজত্ব প্রত্যক্ষ করেছিলেন।
- **আভিজাত্য ও রূপার ছোরা:** ধনী ও আমলা মুসলমানরা হাঁটুর নিচে সাদা 'মরিস্ক শার্ট' বা জুব্বা পরতেন, কোমরে রেশমি ফিতা (শস) ও রুপার খোদাই করা কারুকার্যময় ধারালো ছোরা ঝুলিয়ে রাখতেন। আঙুলে পরতেন সোনার আংটি।
- **নারীদের সুরক্ষিত ও বিলাসী জীবন:** গৃহিণীরা পর্দানশিন থাকতেন এবং অত্যন্ত দামি রেশম ও সোনার গহনা ব্যবহার করতেন। ধনী পুরুষদের ৩-৪ জন স্ত্রী এবং বিপুল দাস-দাসী থাকত। অন্যদিকে সাধারণ মানুষ হাঁটুর ওপর খাটো শার্ট ও মাথায় ৩-৪ পেঁচের ছোট পাগড়ি পরত।

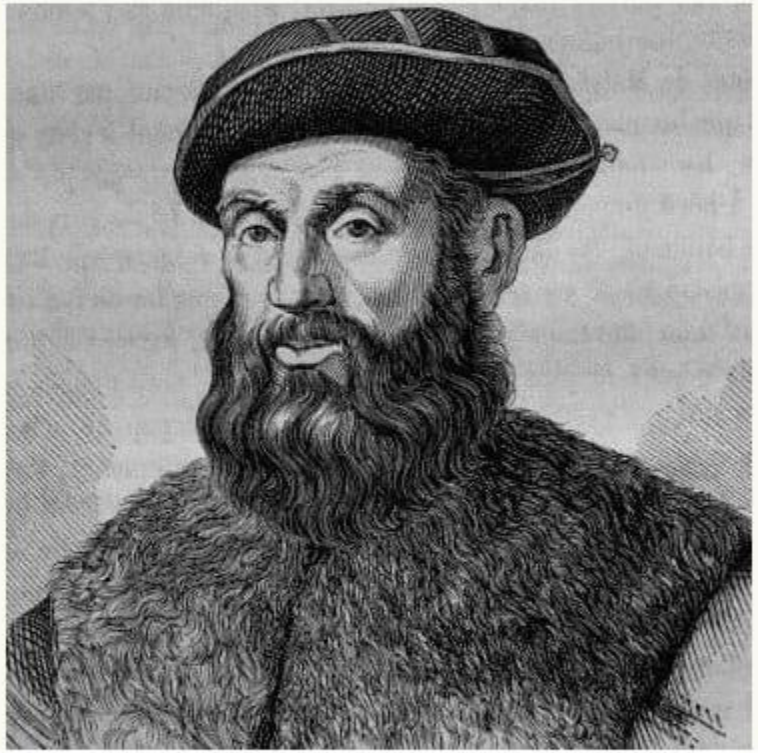

ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র ও 'সরবেতি'

বাংলার সূক্ষ্ম কাপড়ের মধ্যে ছিল সরবেতি (সুন্দরী ললনাদের উত্তরীয়), মমুন, দুগুজা, চৌতর, তোপন ও সিনবাফো। আরব ও পারস্যের বণিকরা এসব কাপড় দিয়ে রাজকীয় টুপি বানিয়ে প্রতি বছর সমুদ্রপথে জাহাজে করে নিয়ে যেতেন।

উৎকৃষ্ট চিনি শিল্প

বাংলায় ব্যাপক ইক্ষুর চাষ হতো এবং অত্যন্ত চমৎকার গুঁড়ো চিনি তৈরি করা হতো। এখানকার মানুষ পাউরুটি বানাতে জানতেন না। তবে তাঁরা কাঁচা চামড়ার বস্তায় চিনি ভরে সমুদ্রপথে বিশ্ববাজারে রপ্তানি করতে পারদর্শী ছিলেন।

সিজার ফ্রেডারিক

ব্যক্তিগত জীবন ও বাংলায় আগমন

ব্যক্তিগত জীবনে ব্যবসায়ী হলেও জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। ১৫৬৭ খ্রিস্টাব্দে ফ্রেডারিক বাংলায় প্রবেশ করেন। প্রথমে উড়িষ্যা এবং পরে চট্টগ্রামে আসেন।

> **সন্দ্বীপের প্রাচুর্য ও অর্থনৈতিক চালচিত্র:**
>
> তৎকালীন সন্দ্বীপে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ছিল অত্যন্ত সস্তা। ব্যবসায়ীদের চমৎকার চরিত্র এবং অত্যন্ত সুলভ মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সহজলভ্যতা তাকে দারুণ মুগ্ধ করে।

অর্ণবপোত নির্মাণের বিশ্বখ্যাত কেন্দ্র

ফ্রেডারিক চট্টগ্রাম বন্দরকে জাহাজ নির্মাণের শ্রেষ্ঠতম কেন্দ্র বলে উল্লেখ করেছেন। আলেকজান্দ্রিয়ায় নির্মিত জাহাজের তুলনায় চট্টগ্রামের নির্মিত জাহাজের কদর ও কার্যকারিতা অনেক বেশি ছিল।

- সন্দ্বীপ ও চট্টগ্রামে জাহাজ নির্মাণের জন্য অত্যন্ত চমৎকার কাঠ ও প্রয়োজনীয় উপকরণ সুলভ মূল্যে প্রচুর পাওয়া যেত।
- চট্টগ্রামের কাজ এতো উন্নত ছিল যে তুরস্কের সুলতান চট্টগ্রাম থেকেই তাঁর বড় বড় যুদ্ধজাহাজ তৈরি করিয়ে নিতেন।
- বিরাট চট্টগ্রাম বন্দর থেকে পর্যাপ্ত চাল, সুতি ও রেশম বস্ত্র, চিনি ও খাদ্যশস্য পূর্ব দ্বীপপুঞ্জে রপ্তানি করা হতো।

সেবাস্টিন মানরিক

নৌকা ও যুদ্ধতরির বিবরণ

সেবাস্টিন মানরিক বাংলার ঐতিহ্যবাহী নৌযানসমূহের গঠন ও কারুকার্যে দারুণ মুগ্ধ হন। তিনি কোশো, পোর্ক, পতেলা, জেলিয়াসহ নানারকম বাহারি নৌকার বিবরণ দিয়েছেন।

রাজস্ব আদায় ও প্রজা নিপীড়ন:

মানরিক বাংলার এক বিখ্যাত প্রবাদ "**মারে ঠাকুর, না মারে কুকুর**"-এর উল্লেখ করে বলেছেন, তৎকালীন বাঙালি বিনা বেত্রাঘাতে সহজে কর দিত না। কর দিতে অসমর্থ হলে প্রজাদের স্ত্রী ও সন্তানদের কেড়ে প্রকাশ্য নিলামে দাস হিসেবে বিক্রয় করা হতো।

ঢাকা শহরের বিন্যাস

বুড়িগঙ্গার তীরে বিস্তৃত সুন্দর ও সমতল ভূমিতে ঢাকা শহর অবস্থিত ছিল। নদীর তীর ঘেঁষে শহরটি ১ লীগ (৪ মাইলের অধিক) দীর্ঘ ছিল। মানেশ্বর, নারিন্দা ও ফুলবাড়িতে খ্রিস্টানদের আধিক্য ছিল।

পর্তুগিজ বিনিয়োগ

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে পর্তুগিজরা বাংলায় পণ্য ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ২ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছিল। তুলাবস্ত্র, রেশমবস্ত্র, চিনি, মাখন, চাল, নীল, মরিচ, মোম ও লাক্ষা ছিল প্রধান ক্রয় পণ্য।

ঐতিহ্যবাহী মসলিন

ঢাকার কার্পাসবস্ত্র ও অতিসূক্ষ্ম মসলিন খোরাসান, পারস্য, তুরস্ক ও অন্যান্য দেশে রপ্তানি হতো। ৫০/৬০ গজ দীর্ঘ ও ২ গজ চওড়া এক খণ্ড মসলিন একটি সরু বাঁশের চোঙার ভেতর পুরে নেওয়া যেত।

নিকোলা মানুচি

বিপুল পরিমাণ সোনা ও রুপার বিবরণ

মীর জুমলার মৃত্যুর পর শায়েস্তা খান মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের কাছে বাংলার সংগৃহীত কর হিসেবে **৩০০ গাড়ি রুপা এবং ৫০ গাড়ি সোনা** দিল্লিতে প্রেরণ করেন। মানুচি স্বয়ং তা দিল্লিতে দেখেছিলেন।

- **ঢাকা নগরী:** ঢাকা নাতিবৃহৎ হলেও জনবহুল ছিল। সাধারণ ঘরবাড়িগুলো মূলত খড়ের তৈরি ছিল।
- **সুন্দরবন:** সুন্দরবনের বাঘের উপদ্রব ছিল মারাত্মক। বাঘ রাতে নদী সাঁতরে নৌকায় হামলা করে ঘুমন্ত আরোহীদের নিয়ে গভীর জঙ্গলে চলে যেত।
- **সমৃদ্ধ বাণিজ্য:** ঢাকার সূক্ষ্ম মসলিন, রেশম ও লবণ ইউরোপসহ বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হতো।
- **উচ্চ রাজস্ব আয়:** বাংলা ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের অন্যতম ধনী প্রদেশ, যা বিপুল পরিমাণ রাজস্ব প্রদান করত।
- **মুঘল সামরিক মূল্যায়ন:** মানুচির মতে, মুঘল বাহিনী সংখ্যায় বড় হলেও সামরিক দক্ষতায় ইউরোপীয় বাহিনীর তুলনায় দুর্বল ছিল।

টাভার্নিয়ার

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক কেন্দ্র

টাভার্নিয়ার ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা সফর করেন। তাঁর আগমন ছিল সম্পূর্ণরূপে রত্ন ও স্বর্ণালংকার ব্যবসাভিত্তিক। তিনি নবাব শায়েস্তা খানকে মহামূল্যবান রত্নসামগ্রী উপঢৌকন দেন।

- **ঢাকা শহরের দৈর্ঘ্য:** নদীপথের উত্তর তীর ধরে শহরটি ৪ মাইলেরও বেশি দীর্ঘ ছিল এবং ওলন্দাজদের ব্যবসা সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল।
- **বৈশ্বিক বাণিজ্য সূত্র:** নবাবের দরবারে পরিবেশিত চিনা কমলালেবু, ইরানি তরমুজ এবং জাপানের বীজ থেকে উৎপাদিত শিম প্রমাণ করে তৎকালীন বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুদৃঢ় সংযোগ ছিল।
- **নৌ-শিল্পের উন্নতি:** বাংলার কারিগরদের নির্মিত রণপোত ও নৌযান বিদেশি বণিকদের কাছেও অত্যন্ত সমাদৃত ছিল।
- **অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি:** বাংলার সমৃদ্ধ বাজার, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিপুল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিদেশি পর্যটকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল।